প্রিয় গগন ও অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রিয় গগন এবং অন্যান্য

www.BanglaBook.org

সূচি

প্রিয় গগন
আমার ছেলেবেলা
বইয়ের মেলা এবং মেলার বই
আলতা এবং তানিয়ারা—(এক)
আলতা এবং তানিয়ারা (দুই)
শুভ জন্মদিন
ছাত্র রাজনীতির 'যদি' এবং 'কিন্তু'
নিউক্লিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ
ইনডেমনিটি কালচার
আর মুখস্থ নয়
বাংলাদেশ এবং তথ্য প্রযুক্তি
বিচারের শেষ নয়—বিচারের শুরু

প্রিয় গগন

১.

গগন নামে বাংলাদেশের একজন তরুণকে কয়েকমাস আগে বেলজিয়ামে কয়েকজন পাকিস্তানি মিলে হত্যা করেছিল। আমি গগনকে দেখিনি কিন্তু তবু মনে হয় আমি বুঝি তাকে খুব ভালভাবে চিনি। একাত্তরে এই গগনের মতো তরুণেরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে পেশাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। দেশের জন্য তাদের বুক ভরা ভালবাসা, এই দেশ নিয়ে তাদের স্বপ্ন, তাদের অহঙ্কার। বেলজিয়ামের পথে কিছু পাকিস্তানি তরুণের বাংলাদেশকে নিয়ে কুৎসিত গালাগাল গগন সহ্য করেনি। গগন প্রতিবাদ করেছিল, মানুষ যেভাবে মায়ের সম্মান রক্ষা করে, বিদেশের মাটিতে সে সেইভাবে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের সেই তরুণেরা তখন তাকে বেলজিয়ামের রাজপথে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে—যে নৃশংসতায় আজ থেকে দুই যুগ আগে তারা এদেশের ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এটি সেই একই নৃশংসতা। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটি সেই একই ধারাবাহিকতা, একাত্তরেও পাকিস্তানিরা জানত তারা কোনো ভুল করেনি, এতদিন পরেও তারা জানে এখনো তারা কোনো ভুল করছে না। প্রয়োজনে এখনো তারা বাংলাদেশীদের হত্যা করতে পারে।

গগন ক্রিকেট খেলা ভালবাসত কি না আমি জানি না। পাকিস্তানের ক্রিকেট টীম তার প্রিয় টীম ছিল কি না আমি সেটাও জানি না—হলেও অবাক হব না। ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান টীমের অপূর্ব নৈপুণ্য যে এটিকে একটি শিল্প পর্যায়ে নিয়ে গেছে সেটি কে অস্বীকার করবে? গগন কখনো কোনো স্টেডিয়ামে পাকিস্তান টীমের ক্রিকেট খেলা দেখেছে কি না আমি জানি না। আমি শুধু একটি জিনিস জানি, আর যাই করুক পাকিস্তান টীমের সমর্থনে স্টেডিয়ামে সে কখনোই পাকিস্তানের পতাকা তুলে উদ্বাহু নৃত্য করত না। বাংলাদেশের যে নাগরিক দেশটির জন্য ইতিহাস জানে, এই দেশের জন্য যার বিন্দুমাত্র ভালবাসা রয়েছে, সম্মান বোধ রয়েছে, দেশের শহীদদের জন্য যার এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে সে অন্য যেভাবেই তাদের সমর্থন প্রকাশ করুক না কেন, নিজের দেশের মাটিতে সেই দেশের জাতীয় পতাকাটি হাতে তুলে নিতে পারে না। গগনের নিজের দেশের জন্য গভীর ভালবাসা ছিল, আমি নিশ্চিত সে কখনোই তার হাতে সেই পতাকাটি তুলে নিত না।

জাতীয় পতাকা একটুকরা কাপড় নয়, সেটি বিশাল একটি ব্যাপার। একজন স্বাধীন দেশের মানুষ কখনো অন্য দেশের পতাকা হাতে তুলে নেয় না। সে পতাকাটি এই দেশের মাটি থেকে সরানোর জন্য ত্রিশ লাখ মানুষকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে, যে দেশ কখনো পৃথিবীর সেই জঘন্যতম গণহত্যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি সেই দেশের জাতীয় পতাকাটি হাতে তুলে নেওয়ার মাঝে যে একটি ভয়ঙ্কর

কুরুচি, দেশের সম্মানবোধের প্রতি একটি অশ্লীল অবহেলা রয়েছে, সেটি কি কখনো কিছু তরুণকে বলে দেওয়া হয়নি। দেশের ইতিহাস না জেনে কীভাবে একটি প্রজন্ম এই দেশে বড় হয়ে গেল?

ইনডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট খেলায় একজন তরুণী প্ল্যাকার্ডে লিখে পাকিস্তানের সুদর্শন ক্রিকেট খেলোয়াড় আফ্রিদিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটি আমার কাছে খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। সুদর্শন খেলোয়াড়রা যদি দেশের সীমানা, ভাষার ব্যবধান, সংস্কৃতির দূরত্ব ভেঙে পৃথিবীর তরুণীদের হৃদয় জয় না করে তাহলে কারা করবে? তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে সেটি যদি প্ল্যাকার্ডে লিখে প্রকাশ করে সেটি এমন কী অস্বাভাবিক ব্যাপার? দর্শকরা একসময় জনৈক পাকিস্তানি খেলোয়াড়, সম্ভবত আসিফ ইকবাল এর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যানার টানিয়েছে, প্রিয় খেলোয়াড়কে শুভাশীষ জানানোর সেই প্রক্রিয়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। খেলার মাঠে প্রতিটি বাউন্ডারিতে, প্রতিটি ছক্কায় বা প্রতিপক্ষ টীমের খেলোয়াড়কে আউট করার প্রতিটি ঘটনায় করতালি দিয়ে স্টেডিয়ামকে মুখরিত করার বা খেলোয়াড়দের ছবি, তাদের সম্পর্কে কথাবার্তা প্ল্যাকার্ড নাড়ানোর প্রতিটি ঘটনায় ক্রিকেট খেলা উপভোগ করার সেই উষ্ণ অনুভূতি আমাকেও স্পর্শ করেছে।

কিন্তু প্রতিবার যখন একজন তরুণ বা তরুণীকে পাকিস্তানের পতাকা হাতে তুলে নিতে দেখেছি, ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হয়েছে। একজন স্বাধীন দেশের মানুষ অন্য দেশের জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নিতে পারে না— এই কথাটি কী কেউ এদেশের তরুণ-তরুণীকে বলে দেয়নি? খেলায় ভারতবর্ষেরও তো প্রচুর সমর্থক ছিল কিন্তু স্টেডিয়ামে তো ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা সেরকমভাবে ছিল না। এটি কি আমার চোখের ভুল না কি এর পিছনেও অন্য কোনো গোপন রহস্য রয়েছে? ক্রিকেট নামক নিরীহ একটি খেলার সূত্র ধরে কি এই দেশের পাকিস্তান প্রেমিক দেশদ্রোহীরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে? স্টেডিয়ামে যে বিশাল একটি পাকিস্তানের পতাকা দেখেছি সেটি কে তৈরি করে এনেছিল?

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন আমাদের জাতীয় দিবসগুলো পালন করার সময় মাঝে মাঝে আমাদের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়েছে। অন্য একটি দেশে থাকার কারণে আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে পারিনি, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারিনি। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে অন্য দেশের জাতীয় পতাকা তোলার বা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যতবার আমরা বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শন করেছি ততবার একই সঙ্গে পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা প্রদর্শন করতে হয়েছে। যতবার আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে চেয়েছি ততবার তার আগে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত 'স্টার স্প্যাংগলড ব্যানার' গেয়ে শোনাতে হয়েছে। মনে আছে যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন আমি এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে দেশে ফেরার অপেক্ষা করতাম, যেই ভূখণ্ডে আমি

যখন খুশি আমার দেশের জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারব, যতবার খুশি 'আমার সোনার বাংলা' গান গাইতে পারব।

আমাদের দেশে যখন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানেরা আসেন তখন তাদের সম্মানার্থে সেই দেশের পতাকা দিয়ে পথঘাট সজ্জিত করা হয়, কিন্তু সব সময়েই পাশাপাশি আমাদের নিজেদের জাতীয় পতাকাটি রাখা হয়। ছোট ছোট শিশুদের মাঝে মাঝে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পথের দুপাশে দাঁড় করানো হয়, তারা সেই দেশের ছোট ছোট পতাকা হাতে নিয়ে নাড়তে থাকে, কিন্তু সব সময় সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে নিজের দেশের পতাকা ধরে রাখে। কখনো কখনো কোনো বিদেশীদের নিজের দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে তাদের জাতীয় পতাকা তোলার প্রয়োজন হতে পারে, সব সময়েই তখন তাদের পাশ-পাশি বাংলাদেশের পতাকা তুলতে হবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের প্রশাসন, ক্রিকেট খেলার আয়োজকেরা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস লক্ষ্য না করে কিছু রুচিহীন তরুণ-তরুণী দিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে নিজের অবমাননা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আরো একটি দুষ্টিকটু ব্যাপার ঘটেছে, খেলার শেষে যখন কোনো একজন উপস্থাপক ফাইনাল দলের দুই দলপতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেন। পাকিস্তান দলের দলপতি (সম্ভবত ইংরেজি জানেন না বলে) নিজেদের ভাষায় অনেকক্ষণ কথা বলে গেলেন যার একটি বর্ণও আমরা কিছু বুঝলাম না। যে দেশের মাটিতে খেলতে এসেছেন সেই দেশের মানুষের প্রতি এতটুকু সম্মান বোধ থাকলে একজন দলপতি এরকম আচরণ করতে পারেন না। যে উপস্থাপক দলপতিদের সাক্ষাৎকারটি নিলেন তিনি নিজেও সম্ভবত অকাট মূর্খ, তা না হলে যে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সাক্ষাৎকারটি নিচ্ছেন সেই দেশের মানুষ কিছু বুঝতে পারল না ব্যাপারটি কি তার খেয়াল করা উচিত ছিল না, বক্তব্যের সারমর্মটি কি অন্তত ইংরেজিতে বলে দেওয়া যেত না? ক্রিকেট খেলার আয়োজকরা কি ভবিষ্যতে এই ব্যাপারগুলো দেখবেন?

বাংলাদেশের মাটিতে আরো অসংখ্যবার পৃথিবীর নানা দেশের ক্রিকেট দল এসে ক্রিকেট খেলবেন। আমাদের দেশের ক্রিকেট প্রেমিকরা সেই খেলা উপভোগ করবেন। তরুণ-তরুণীরা তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবেন, প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবি নিয়ে নৃত্য করবেন, ব্যানারে প্ল্যাকার্ডে ভালবাসা জানাবেন, করতালি দিয়ে স্টেডিয়াম মুখরিত করবেন, কিন্তু কখনোই সেই দেশের জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নেবেন না। সেই দেশের নাগরিক তার নিজের দেশের পতাকা হাতে নিতে পারেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের পতাকা তাদের হাতে থাকতে হবে।

উনিশ শ একাত্তর সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে সহযোগীদের নিয়ে এই দেশের গণহত্যা করেছিল তারা এখনো এদেশে রয়েছে, তাদের হাতে দেশের নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, ক্রিকেট খেলার সুযোগে অতি সহজে তাদের হাতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উঠে আসে। আমরা যারা একাত্তরের রক্তস্নাত দেশে বড় হয়েছি আমাদের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। রুচির কথা বলে যদি তাদের

www.BanglaBook.org

নিবৃত্ত করা না যায় স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের আইনের কথা বলে তাদের নিবৃত্ত করতে হবে।

৩.

ইনডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট খেলা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে বহুদিন পর আমার পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দেখার সুযোগ হল। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার বিষয়টি এলেই আমি একটি বিশেষ জিনিস না বলে পারি না। ব্যাপারটি আমি আগেও বলেছি। আমার ধারণা বৈজ্ঞানিক তথ্য একাধিকবার পরিবেশ করলেও ক্ষতি নেই। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা যারা লক্ষ্য করে দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এই পতাকায় একটি বাঁকা সরু চাঁদ এবং ঠিক তার মাঝখানে একটি তারা রয়েছে। চাঁদ কিন্তু আসলে বাঁকা কাস্তের মতো নয়, চাঁদ গোলাকার, পূর্ণিমার রাতে যখন পুরোটা দেখা যায় তখন আমরা সবাই সেটা দেখতে পাই। নতুন চাঁদকে বা অমাবশ্যার আগে আগে চাঁদকে বাঁকা কাস্তের মতো দেখায়। কারণ তখন সূর্যের আলো এক পাশ থেকে চাঁদের ওপর পড়ে। যেটুকু অংশে আলো পড়ে আমরা সেটুকু দেখতে পাই, বাকী অংশটুকু দেখতে পাই না—এই হচ্ছে পার্থক্য। রাতের আকাশে চাঁদ যেমন দেখা যায়, তারাও সেভাবেই দেখা যায়। চাঁদ আমাদের একেবারে কাছাকাছি, তারাগুলো বহু দূরে। সবেচেয়ে কাছের যে তারা—আলফা সেঞ্চুরি সেখান থেকেও পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে চার বছর লেগে যায়। কাজেই রাতের আকাশে কাছের চাঁদ আসলে দূরের তারাকে আড়াল করে রাখে। পাকিস্তানের পতাকায় যেরকম চাঁদের মাঝখানে তারা দেখা যায় সেটি কখনোই হওয়া সম্ভব নয়, এটি উদ্ভট এবং অবৈজ্ঞানিক। এটি হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র একটি উপায়ে—কেউ যদি চাঁদের মাঝখানে বিশাল গর্ত খুঁড়ে রাখে আর সেই গর্তের ভিতর দিয়ে অন্য পাশের তারাকে দেখা যায়! আমরা যতদূর জানি সেরকম গর্ত কেউ খুঁড়ে রাখেনি!

পৃথিবীর আরো অনেক দেশ তাদের জাতীয় পতাকাতে চাঁদকে ব্যবহার করেছে। চাঁদের সঙ্গে তারা ব্যবহার করেছে তারা ব্যাপারটিকে বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য তারাটিকে চাঁদের বৃত্তাকার অংশের বাইরে রেখেছে—তুরস্কের জাতীয় পতাকা হচ্ছে তার উদাহরণ।

মুসলমান সংস্কৃতিতে চাঁদের, বিশেষ করে নতুন চাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুসলমান স্থাপত্যে তাই প্রায় সময়েই চাঁদকে ব্যবহার করতে দেখা যায়, তবে প্রায় সব সময়েই সেটি শুধু চাঁদ, চাঁদ এবং তারা নয়। জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচীন মুসলমান বিজ্ঞানীরা অসম্ভব দক্ষ ছিলেন, তারা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার মতো এরকম বড় ভুল করবেন তার সম্ভাবনা কম। রেড ক্রসের অনুরূপ যে রেড ক্রিসেন্ট তৈরি করা হয়েছে সেখানেও কিন্তু চাঁদকে রাখা হয়েছে, চাঁদ এবং তারাকে নয়।

মুসলমান সংস্কৃতিতে আনন্দোৎসবের সঙ্গে যে চাঁদের সম্পর্ক সেটি নতুন চাঁদ; পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় যে চাঁদ রয়েছে সেটি কিন্তু নতুন চাঁদ নয়, সেটি

অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার আগের মুহূর্তের ক্ষীয়মান চাঁদ। (শুক্ল পক্ষের এবং কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ বুঝা খুব সহজ, শুক্ল পক্ষের চাঁদ বন্ধনীর ডান দিকের অংশের মতো, ')'-কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ বন্ধনীর বাম দিকে অংশের মতো, '('—পাকিস্তানের পতাকায় যেরকম রয়েছে)। আমাদের দেশে ঈদ এবং রোজার সময়ে, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, মসজিদের গায়ে বা গম্বুজে যখন অলঙ্করণ হিসেবে চাঁদকে ব্যবহার করা হয় সেটি যদি তারাবিহীন নতুন চাঁদ হয় তাহলে সেটি শুধু বেশি বিজ্ঞানসম্মত হবে না, মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে আরো সঙ্গতিপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি।

৪.

ভোরের কাগজে দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে 'আমার আমি' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সত্যিকারের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ভোরের কাগজ সিরিজটি চালু রাখার চেষ্টা করল এবং একদিন আমি আবিষ্কার করলাম আমার কাছেও কিছু প্রশ্ন হাজির হয়েছে। সেখানে নানা ধরনের প্রশ্ন থাকে এবং খুব ভাবনা-চিন্তা করে বানিয়ে বানিয়ে তার উত্তর লিখতে হয়। (যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয় 'আপনার কী করতে ভালো লাগে?' তার উত্তরে, 'লেপাইটের কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে' লিখলে চলবে না, লিখতে হবে পূর্ণিমার রাতে জীবনানন্দ দাসের কবিতা আবৃত্তি করতে!) যাই হোক আমি প্রশ্নের উত্তর লিখতে লিখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম, এক জায়গায় আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আমি কোন জিনিসকে ঘৃণা করি। নিজের ভিতরের গ্লানিকে বাইরে প্রকাশ করতে আমার সঙ্কোচ হল, একবার মনে হল আমি প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু এখন মনে হল সেটি হবে নিজের কাছে নিজের প্রতারণা, কারণ আসলে আমি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটি ঘৃণা করি সেটি খুব ভালো করে জানি। আমার মনে হল একটি অনুভূতি যদি আমার ভিতরে তীব্র হয়ে আছে, সেটি প্রকাশ করার সৎ সাহসটুকু আমার থাকা দরকার। আমি লিখলাম, 'ঘৃণা করি : পাকিস্তানকে।'

ভোরের কাগজে সেই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমার একজন ছাত্রী একদিন অত্যন্ত সঙ্কোচে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি পাকিস্তানকে ঘৃণা করেন? কিন্তু সেটা তো একটা দেশ। একটা দেশকে কি ঘৃণা করা যায়? একাত্তরে যারা আমাদেরকে মেরেছে তাদেরকে ঘৃণা করা যায়, রাজাকার আলবদরকে ঘৃণা করা যায় কিন্তু দেশকে কী ঘৃণা করা যায়?"

আমি আমার ছাত্রীটিকে কী বলেছিলাম আমার মনে নেই, কিন্তু এটুকু জানি আমি তাকে সদুত্তর দিতে পারিনি। যারা উনিশ শ একাত্তর সালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে আটকা পড়ে পাকিস্তানকে দেখেনি, যাদের কাছে পাকিস্তান দেশটি শুধুমাত্র পৃথিবীর সেরা ক্রিকেট টীমের একটি দেশ তারা আসলে কখনো আমাদের অনুভূতি বুঝতে পারবে না। আমি আসলে বুঝাতেও চাই না, আমার ভিতরে যে ঘৃণা আমি সেটি তাদের ভিতরে সঞ্চারিত করতে চাই না। কমবয়সী বাচ্চা একটি মেয়ের ভিতরে যে উদারতা রয়েছে, খোলা মন রয়েছে আমার ভিতরে সেটি নেই

www.BanglaBook.org

আবিষ্কার করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছি কিন্তু আমি আবিষ্কার করেছি, আমার কিছু করার নেই। জোর করে বুক থেকে ঘৃণাকে উৎপাটিত করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ আঠার বছর থাকার সময় যেখানে পাকিস্তানের মানুষ থাকতে পারে আমি সেখানে যাইনি। কোলাকুলি করে যদি আবিষ্কার করি মানুষটি একাত্তরে আমাদের দেশের কোনো মেয়েকে রেপ করে এসেছে—আমার কোনো বন্ধুকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে এসেছে! কোনো পাকিস্তানি দোকান থেকে আমি কখনো কিছু কিনিনি, যুক্তরাষ্ট্রে যেতে আসতে প্লেনে ওঠার আগে আমি নিশ্চিত হয়েছি সেই প্লেনটি যেন রিফুয়েলিঙের জন্যও পাকিস্তানের মাটি স্পর্শ না করে—আমি তার জন্য অনেক অর্থ দণ্ড দিয়েছি। আমার এই আচরণের জন্য আমার নিজের ভিতরে এতটুকু গর্ব নেই, বিন্দুমাত্র আত্মপ্রসাদ নেই, কিন্তু আমি জানি আমার কিছু করার নেই, আমাকে এই তীব্র ঘৃণা বুকের ভিতরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আমি খানিকটা বিস্ময় এবং দুঃখ নিয়ে আবিষ্কার করেছি আমার মতো আরো অনেকে তাদের বুকের মাঝে এই তীব্র ঘৃণা বহন করে নিচ্ছে। লেখালেখি করি বলে আমার কাছে পাঠকের অনেক চিঠি আসে, হাতের কাছে নেই বলে একটা চিঠির খানিকটা হুবহু তুলে দিতে পারছি না যেখানে একজন তরুণী আমাকে লিখে জানিয়েছেন, তিনি শৈশবে ফ্রক পরতেন, একটু বড় হয়েই তিনি শাড়ি পরা শুরু করেছেন। কখনো তিনি সালোয়ার কামিজ পরেননি, তার কাছে মনে হয়েছে এটা পাকিস্তানি পোশাক—তিনি মরে গেলেও পাকিস্তানি পোশাক পরবেন না। পাকিস্তান যদি একাত্তরের গণহত্যার জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইত, এদেশের মেয়েদের অবমাননা করার জন্য অনুতপ্ত হত, আমি হয়ত আমার বুকের ভিতর থেকে ঘৃণার বিষবাষ্প সরাতে পারতাম। কিন্তু সেটি ঘটেনি, গত দুই যুগে পাকিস্তানে এক সরকারের পর অন্য আরেক সরকার এসেছে কিন্তু কেউই বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি। শুধু যে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি তাই নয়, তাদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা একাত্তরের প্রকৃত ইতিহাসটুকুও জানে না। যেটুকু জানে সেটুকু বিকৃত, সেই ইতিহাসের জ্ঞানটুকু নিয়ে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের প্রতি এক বিচিত্র অবজ্ঞা নিয়ে বড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন আমি পাকিস্তানি তরুণদের বাংলাদেশী নিউজগ্রুপে এই ধরনের চিঠি লিখতে দেখেছি : 'বাংলাদেশের সবকিছু কুৎসিত, শুধু তাদের রমণীরা আকর্ষণীয়—আমাদের যে সব পাকিস্তানি জওয়ানরা একাত্তরে তাদের ধর্ষণ করেছিল আমরা তাদের কাছে শুনেছি।' একটি জাতি থেকে যদি একজন মানুষও এই চিন্তাধারা নিয়ে বড় হয় তাহলেই কি আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কথা নয়? গগনের হত্যাকাণ্ডটিকে কি তখন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয়?

সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন ইনডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেন বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করছে তখন তিনি কি একটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য নিয়ে দেশে ফিরে যান না? সত্তরের নির্বাচনে যথাযথ ক্ষমতা হস্তান্তর হলেই হস্তান্তর হলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা নামক 'ভুল'টি ঘটত না—এই কথা বলার দুঃসাহস কি—আমরাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে তৈরি করে দেইনি?

আমার মনে হয় এখন এককভাবে, সমষ্টিগতভাবে, জাতিগতভাবে কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে আমাদেরকে দাবি করতে হবে-পাকিস্তানকে একাত্তরের গণহত্যার জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে হবে।

৫.

ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলার পরদিন আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল খেলা দেখেছেন?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'দেখেছি।'

'কাকে সাপোর্ট করেছেন?'

আমি খেলাধুলা ভালো বুঝি না। তবে যে কোনো প্রতিযোগিতায় যদি পাকিস্তান থাকে আমি সব সময় তাদের প্রতিপক্ষকে সমর্থন করি। আমি তাকে সেকথা জানালাম। তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন, 'যে দেশকে পরাজিত করে ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছি আজ সেই দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ নিয়ে যাবে, এটা কি হতে পারে?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না, পারে না।'

তিনি গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই দেশের মানুষ বেইমানী করতে পারে কিন্তু এই দেশের মাটি কখনো বেইমানী করবে না।'

আমার তার কথাটি বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল।

*

বিগত কোনো এক সংখ্যা ভোরের কাগজের নিঃসঙ্গ বচন কলামে আমি লিখেছিলাম যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কাজকর্মের জন্য কিছু ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার পর অল্প কিছু ছাত্র ক্যাম্পাসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রেখেছে। সরকারের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত সকল ছাত্রকে তাদের শাস্তি গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। আমি শুনতে পেয়েছি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রথমবার আবিষ্কার করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ইচ্ছে করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের বরখাস্ত করে দেওয়া যায় না। তবে আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে সঠিক ভূমিকা পালন করে 'সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার ক্ষমা নেই' এই নীতিটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।

ভোরের কাগজ
৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

আমার ছেলেবেলা

ব্যক্তিগত কথা দশজনকে বলতে এক ধরনের সাহসের প্রয়োজন, প্রথমেই স্বীকার করে নিই আমার সেই সাহস নেই। তবে অনুরোধ আমি ইতঃপূর্বে শুধু ঢেঁকি নয় জাহাজ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করেছি। কাজেই এ ধরনের একটি লেখা লিখতে যে রাজি হয়েছি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ছেলেবেলার মতো একটি বিশাল ব্যাপার গুছিয়ে কয়েক পৃষ্ঠার মাঝে লিখে ফেলা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই এটি যে সম্পর্কবিহীন কিছু ঘটনার একটি আবেগতাড়িত স্মৃতিচারণ হবে সে সম্পর্কে আগেই পাঠকদের সতর্ক করে রাখছি।

খুব শৈশবে আমাদের সময়ের বড় অংশটুকু চলে যায় চারপাশে কী ঘটছে সেটা বুঝতে। আমার বেলায় সেটি একটি বেশি রকম সত্যি ছিল। কারণ জন্মসূত্রে আমি একটু হাবাগোবা ধরনের ছিলাম। জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি চারপাশে নানা ধরনের ঘটনা যাচ্ছে, কোনো কোনো ঘটনা একেবারে সরাসরি আমার জীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে কিন্তু শুধুমাত্র বয়স কম বলে তার কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। প্রথম যে ঘটনাটিতে আমি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলাম সেটি আমার আয়ু সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে। আমার বাবার জ্যোতিষীচর্চায় খুব শখ ছিল, আমার হাত দেখে একদিন বললেন যে, আমি ৮০ বছর বাঁচব। সংখ্যার আপেক্ষিক মান সম্পর্কে আমার তখন কোনো ধারণা নেই, বেঁচে থাকার জন্য ৮০ সংখ্যাটিকে আমার খুব ক্ষুদ্র বলে মনে হল। 'মাত্র' ৮০ বছর পর আমাকে মরে যেতে হবে বলে আমার খুব মন খারাপ হল। সে রাতে আমার চোখে ঘুম এল না এবং আমি সারা রাত কেঁদে কেঁদে আক্ষরিক অর্থে বালিশ ভিজিয়ে ফেললাম। গভীর রাতে মা ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে কারণটি জানতে চাইলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'আমি নাকি মাত্র ৮০ বছর বাঁচব!'

গভীর রাতে আমার বাবাকে ঘুম থেকে উঠে এসে তার ভবিষ্যদ্বাণী ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে আরো দীর্ঘজীবনের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল। বলা যেতে পারে পৃথিবীতে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়ার সেটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা। আমার একমাত্র অস্ত্র ছিল চোখের পানি, সেটি দিয়েই অসাধ্য সাধন করে ফেলেছিলাম!

জ্যোতিষশাস্ত্রে বাবার কৌতূহল হালকা ছিল না, সেটা নিয়ে তিনি রীতিমতো গবেষণা করতেন। পড়াশোনার জন্য অসংখ্য বইপত্র যোগাড় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নানা ধরনের মানুষের হাতের ছাপ যোগাড় করে আনতেন। বাসায় এই ধরনের প্রচুর বইপত্র থাকার কারণে আমরা প্রত্যেক ভাইবোনই জীবনের একটা সময় অল্পবিস্তর জ্যোতিষীচর্চা করেছি (বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তরুণী মেয়েদের হাত দেখে আমি বিশেষ নাম করেছিলাম। এক

প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক সিগারেট কিনে দিলে আমি প্রেম ও বিবাহ বিষয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে দিতাম)।

খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। জ্যোতিষীবিদ্যা অনুযায়ী হাতে যে রেখা থাকলে একজন মানুষের ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনায় অপঘাতে মৃত্যু হয়, আমার বাবার হাতে সেই রেখা ছিল এবং সত্যি সত্যি তিনি একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যান। সেই বয়সে ব্যাপারটি আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল, তাহলে সত্যিই কি জ্যোতিষীশাস্ত্র ভবিষ্যৎ বলতে পারে? সত্যিই কি সবই নিয়তি এবং আমাদের কিছুই করার নেই? ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি মর্গে গিয়ে অপঘাতে মৃত অসংখ্য মানুষের হাত দেখেছি! শুধু তাই নয়, একাত্তরে পরিচিত-অপরিচিত অনেকের হাত আমি দেখে রেখেছিলাম যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাদের কারো হাতেই কিন্তু অপঘাতে মৃত্যুর সেই চিহ্ন খুঁজে পাইনি। জ্যোতিষীশাস্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ বলতে পারে না এবং আমাদের জীবন যে নিয়তি নয় সেটা জেনে আমি খুব স্বস্তি পেয়েছিলাম। বাবার হাতের সেই চিহ্নটি একটি কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া কিছু নয়—সেটাই আমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তরুণীদের হাত দেখে বিনি পয়সায় সিগারেট খাওয়া ছাড়া এই বিদ্যাটির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। সে ব্যাপারেও বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, হাত দেখে ভবিষ্যৎ স্বামীর আকর্ষণীয় বর্ণনা দেওয়া একজন তরুণীকে বিয়ে করে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পুরোটাই ভুল প্রমাণিত হওয়ার বিড়ম্বনাটুকু আমার সারা জীবন বহন করতে হয়েছে!

আমার বাবা শুধু যে জ্যোতিষীশাস্ত্রে উৎসাহী ছিলেন তাই নয়, পরকাল নিয়েও তার খুব উৎসাহ ছিল। জন্মান্তর রহস্য জাতীয় প্রচুর দেশী এবং বিদেশী বই যোগাড় করেছিলেন এবং সেইসব বই পড়ে ফুলে পড়তেই আমরা খানিকটা ইঁদুরপোকা হয়ে গিয়েছিলাম। যখন তখন প্ল্যানচেটে বসে মৃত আত্মাদের টানাটানি করা আমাদের এক ধরনের বাজে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তেপায়া টেবিলে চক্রে বসা, মিডিয়ামের ওপর আত্মার ভর করানো জাতীয় ব্যাপারগুলো এত ঘন ঘন করানো হতো যে, এই ব্যাপারগুলোর পুরো রহস্যটুকুই আমাদের কাছ থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল। এগুলো সত্যি নাকি কোনো ধরনের স্বেচ্ছা সম্মোহন—ব্যাপারটি বুঝার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কোনোভাবে 'মৃত আত্মাকে' হাজির করাতে পারলেই আমরা তার নাম-ঠিকানা লিখে রেখে সেখানে চিঠি পাঠাতাম। বলতে কোনো দ্বিধা নেই, কখনো সেই সব চিঠির উত্তর আসেনি। প্রচলিত বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং সত্যিকার অর্থে অলৌকিক কোনো ঘটনা এখনো আমার চোখে পড়েনি।

সত্যিকারের ভূত ব্যাপারটি খুব সহজ ছিল না বলেই হয়ত নকল ভূতে আমার বাবার শখ খুব কম ছিল না। একবার গ্রাম থেকে তার দূর সম্পর্কের ভাই বেড়াতে এসেছেন। তিনি গ্রামের অবস্থাপন্ন মানুষ। সে যুগের অবস্থাপন্ন মানুষেরা প্রথমে সাইকেল এবং তারপর একটা বন্দুক কিনতেন। তিনি ইতোমধ্যে সাইকেল কিনে

www.BanglaBook.org

ফেলেছেন, এবারে বন্দুক কিনতে এসেছেন। এক রাতে বাবা ঠিক করলেন তাকে ভয় দেখাবেন। গভীর রাতে তিনি তার ঘরে ঢুকে দুই হাত ওপরে তুলে সারা শরীরে সাদা শাড়ি পেঁচিয়ে ভূত সেজে রইলেন। গভীর রাতে আমাদের অতিথি বিশাল দীর্ঘ ভূত দেখে আঁ আঁ করে চিৎকার করে বাবাকে জড়িয়ে ধরে যা একটা কাণ্ড করলেন, সে আর বলার মতো নয়। বড় হয়েও যে বাচ্চাদের কাজকর্মগুলো করা যেতে পারে সেটা আমি আমার বাবার কাছে শিখেছিলাম। আমি নিজেও বড় হওয়ার পরও কত মানুষকে যে কতভাবে ভয় দেখিয়ে মজা করেছি, সেটা বলে শেষ করা যাবে না।

যাই হোক, বাবার সেই দূর সম্পর্কের ভাই সেই বন্দুকটি খুব বেশিদিন নিজের কাছে রাখতে পারেননি। গ্রামাঞ্চলের চোর-ডাকাতদের জন্য বন্দুক খুব লোভনীয় জিনিস, কাজেই একদিন সেটি তার গ্রামের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেল। আগ্নেয়াস্ত্র চুরি হওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার। চুরি ব্যাপারটি পুলিশের কাছে আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তিনি নিজেই নিজের বাড়িতে রাত জেগে সিঁদ কেটে রাখলেন। পুলিশ তদন্ত করতে এসে আকাশ থেকে পড়ল, চোরেরা বাইরে থেকে সিঁদ কেটে ভিতরে ঢোকে, এখানে মনে হচ্ছে চোর ভিতরেই ছিল, সিঁদ কেটে বেরিয়ে এসেছে! কাটা মাটি সব ঘরের ভিতরে কেমন করে এল সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাবার দূর সম্পর্কের সেই ভাইয়ের কী নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল সেটা দীর্ঘদিন আমাদের পারিবারিক কৌতুকের একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

জ্যোতিষীশাস্ত্র এবং পরকাল ছাড়াও বাবার যে বিষয়ে সত্যিকার শখ ছিল সেটি হচ্ছে সাহিত্য। তার কোনোরকম বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বা কষ্টেসৃষ্টে কোথাও এক টুকরা জমি রেখে দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলো তার মাথাতেই ঢুকত না। বাবা স্বল্প বেতনের একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন, আমরা এতগুলো ভাইবোন, বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মাকে সাহায্য করতে হত, এক-দুজন মামা-চাচা সবসময়েই আমাদের সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করতেন। এ রকম অবস্থায় বইপুস্তক ছিল একটি বড় ধরনের বিলাসিতা। কিন্তু বাবার সেই বিলাসিতাটুকু ছিল ষোল আনার ওপর আঠার আনা। আমরা সেই বিলাসিতাতে খুব অল্প বয়সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। 'আউট বই' পড়ার জন্য আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা যখন তাদের বাবা-চাচার কাছে বেধড়ক পিটুনি খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় বাবা আমাদের হাতে মোটা মোটা বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে দিয়েছেন। বই নিয়ে আলোচনা করেছেন, মতামত জানতে চেয়েছেন, লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। বড় হয়ে লেখক হব ভুলেও সেটা কখনো আমাদের মাথায় আসেনি কিন্তু লেখা ব্যাপারটা আমাদের পরিবারের জন্য খুব সহজ একটা ব্যাপার ছিল। মানুষ যে রকম করে চিঠি লিখে কিংবা বাজারের ফর্দ লিখে আমরা সেভাবে গল্প-কবিতা লিখতাম। সেইসব লেখা পত্রপত্রিকায়' ছাপাতে হবে, সেরকম তাড়না কিন্তু কখনো কারো মধ্যে ছিল না।

বাবা আমাদের লেখালেখিকে কত গুরুত্ব দিতেন তার একটা উদাহরণ দিই। তিনি নিজেও লিখতেন বলে একবার তার কাছে মহাকাশের অভিযান নামে একটা

বই এল, তার সমালোচনা লিখতে হবে। বাবা বিজ্ঞানের ব্যাপারে বেশি স্তুতি বোধ করেন না, তাই আমাকে সেই বইয়ের সমালোচনা লেখার 'সার-কন্ট্রাক্ট' দিলেন। আমার বয়স তখন ১২ কিংবা ১৩, কিন্তু আমি মোটেও না ঘাবড়ে খুব কায়দা করে বড়দের যেভাবে সমালোচনা লিখে সেরকম একটা সমালোচনা লিখে ফেললাম। বড়দের ম্যাগাজিনে সেটা প্রকাশিতও হল। কেউ জানতেও পারল না সেটা একটা বাচ্চা ছেলের লেখা!

বাবার জীবনধারা আমাদের ভাইবোনদের বেঁচে থাকার দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিল, কাজে খুব ব্যস্ত থাকতেন বলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব বেশি ছিল না, সেটা ছিল পুরোপুরি আমাদের মায়ের নিয়ন্ত্রণে। সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে আমার মায়ের পদ্ধতিটি ছিল খুব সহজ এবং সরল। সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে আসতে হবে, এ ছাড়া সকল ব্যাপারে একেবারে পুরোপুরি স্বাধীনতা। নানারকম বিচিত্র বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে একেবারে পুরোপুরি বখে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কেউই বখে যাইনি। আমার বাবা সিগারেট খেতেন, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন এবং তার সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গিটাও ছিল অপূর্ব। কাজেই আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম বড় হয়ে বাবার মতো করে সিগারেট খাব, কিন্তু সত্যি সত্যি বড় না হয়ে কেউ সিগারেট স্পর্শ করিনি।

পুরো স্বাধীনতা থাকায় স্কুলে যাওয়ার সময়টুকু ছেড়ে দিয়ে বাকি সময় পুরোটুকু টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। হাতে পয়সাকড়ি থাকত না বলে পয়সা খরচ করে আনন্দ করার উপায় ছিল না, সকল আনন্দই ছিল বিনি পয়সার আনন্দ। কোথায় কুমিরছানা, কোথায় দুই মাথাওয়ালা গরু, কোথায় লাশকাটা ঘরে লাশ কাটা হচ্ছে—এইসব ঘুরে ঘুরে দেখে চমৎকার সময় কেটে যেত। বয়স যখন ১২-১৩ বছর হল তখন আমার মাথায় বিজ্ঞানের শখ চাপিয়ে উঠল। স্কুলের লাইব্রেরিতে খুব চমৎকার চমৎকার বিদেশী বিজ্ঞানের বই ছিল। কিছু বই লাইব্রেরির বাইরে নেওয়ার কথা নয়, কিন্তু লাইব্রেরিয়ান আমার শখের কথা জেনে বইগুলো বাসায় নিতে দিতেন। সেখানে বিজ্ঞানের নানা ধরনের মজার মজার এক্সপেরিমেন্টের কথা লেখা থাকত, বেশিরভাগই করতে পারতাম না প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে। অনেক কষ্টে পয়সাকড়ি জমিয়ে টুকটাক কিছু জিনিসপত্র কিনে কিছু যন্ত্রপাতি দাঁড়া করালাম—তার একটা হচ্ছে স্লাইড প্রজেক্টর। সিনেমার ফিল্মের কাটা স্লাইড দেওয়া হলে সেটা দেয়ালে বড় হয়ে দেখা যায়। 'দুর্ধর্ষ আবিষ্কার'—বক্সমহলের হুই চই পড়ে গেল। এক বন্ধু তার বাসায় দেখাবে বলে সেটা নিয়ে গায়েব করে দিল। বিজ্ঞানের জগতেও যে চুরিচামারি হয় তখনই আমি প্রথম সেটা জানতে পারলাম।

মনে আছে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য আমার একবার কিছু এসিডের দরকার পড়ল, আমি এক ওষুধের দোকান থেকে শিশি ভরে এসিড কিনে আনলাম। দোকানি আমার মতো ১২ বছরের একটা শিশুর কাছে অবলীলায় শিশি ভরে সালফিউরিক এসিড বিক্রি করে দিল ব্যাপারটি চিন্তা করে এখন আমি শিউরে উঠি। সারা দিন সেই এসিডের শিশি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, কোনো যে অঘটন ঘটেনি সেটা নিশ্চয়ই আমার কয়েক পুরুষের সৌভাগ্যের ফল।

www.BanglaBook.org

বিজ্ঞানের কথা মনে পড়লে আমার আরো একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন নিউটনের গতিসূত্র পড়ে মনে হল সূত্রটিতে ভুল রয়েছে এবং সেটি সংশোধন করা প্রয়োজন। আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং তারা আমার সঙ্গে একমত হল। স্যারদের সঙ্গে আলোচনা সূত্রটি সংশোধন করে একটি কাগজে লিখে ফেললাম, নিচে আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বাক্ষর করে ঘটনার সত্যতার সাক্ষী হয়ে থাকল। কাগজটা খামে ভরে সেটি সিল করে দেওয়া হল। এখন ছোট বলে কেউ আমাদের কথা শোনে না কিন্তু যখন বড় হব তখন এই অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে আমরা সবাই যে বিখ্যাত হয়ে যাব, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না! যদি আমাদের বিজ্ঞান বইগুলো আরো একটু ভালো করে লেখা হত কিংবা আমাদের শিক্ষকরা বিজ্ঞান আরো একটু ভালো করে বোঝাতে পারতেন তাহলে আমি নিশ্চিত বিখ্যাত হওয়া যে এত সহজ নয়, সেটা আমি আরো আগেই আবিষ্কার করতাম!

বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। বদলির চাকরির কারণে দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু সময় থেকেছি। যদিও মূলত আমরা শহরেই বড় হয়েছি কিন্তু আমাদের গ্রামের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ছুটিছাটায় আমরা নানাবাড়ি-দাদাবাড়ি চলে আসতাম। নানাবাড়িতে আমার সমবয়সী বন্ধুবান্ধব বেশি ছিল বলে সেখানে বাড়াবাড়ি স্ফূর্তি হত। পুকুরে ঝাঁপঝাঁপি, সাঁতার, কলাগাছের ভেলা তৈরি করে পানিতে ভেসে বেড়ানো, জাল দিয়ে মাছ ধরা, পাখির ফাঁদ তৈরি করে পাখি ধরা, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো কিছুই বাকি থাকত না। পায়ে কখনো জুতো পরেছি বলে মনে পড়ে না। কাদা, গোবর, কেঁচো, ব্যাঙ, জোঁক, এই ধরনের জিনিস দেখে আজকালকার শিশুরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, শৈশবে কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে ছিল আমাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। মনে আছে, বর্ষাকালে একদিন খেতের আল ধরে আমরা দুই বন্ধু হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ করে সামনে খানিকটা জায়গা এল, সেখানে খানিকটা পানি, সেই পানিতে কিলবিল করছে জোঁক। একসঙ্গে এক জায়গায় এত আকারের এবং এ জোঁক আমি এর আগে দেখিনি। সেই পানিতে পা দিয়েই আমাদের যেতে হবে আর কোনো উপায় নেই। দুই বন্ধু দূর থেকে ছুটে এসে পানিতে এক মুহূর্তের জন্যে এক পা দিয়ে লাফিয়ে অন্যপাশে পার হয়ে গিয়ে যখন আমাদের পায়ের দিকে তাকালাম, আমাদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। পা থেকে পাকা ফলের মতো অসংখ্য জোঁক ঝুলছে। জোঁক যে এত দ্রুত কোনোকিছুকে কামড়ে ধরতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। সেই জোঁকগুলোকে টেনে ছুটিয়ে আনতে আমাদের কালো ঘাম ছুটে গিয়েছিল, এগুলো হয় পিছলে এবং টানলে রবারের মতো লম্বা হতে থাকে—কী যন্ত্রণা!

নানাবাড়িতে মামারা আমাদের খুব স্নেহ করতেন। তাদের বিয়ে উপলক্ষে আমরা স্কুল কামাই করে দীর্ঘদিনের জন্য গ্রামে চলে যেতাম। এক মামার বিয়ে হল ভাটি অঞ্চলে, বর্ষাকালের ভাটি অঞ্চলের মতো রহস্যময় জায়গা মনে হয় পৃথিবীতে একটিও নেই। মামার বিয়ের পর বউ নিয়ে ফিরে আসার পুরো ব্যাপারটা এখনো

আমার চোখের সামনে ভাসে। বিদায় নিয়ে আমরা যখন ফিরে আসি আমার বোন তখন নতুন মামিকে বলল, 'মামি আমাদের চিঠি লিখবেন!'

আমার মামি ছিলেন নিরক্ষর, আমরা কেউ সেটা জানতাম না। চিঠি লেখার মতো সহজ একটা ব্যাপারও তিনি করতে পারছেন না, ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাকে খুব পীড়িত করেছিল। শুধুমাত্র আমাদের চিঠি লেখার জন্য আমার সেই মামি গোপনে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পড়ালেখা শিখেছিলেন। এ রকম জেদি একটা মেয়ের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার জীবনটি ছিল অসম্ভব ঘটনাবহুল এবং অত্যন্ত দুঃখের। লেখালেখির নাম করে আমি আমার জীবনে প্রচুর কাগজ নষ্ট করেছি, মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কোনোভাবে শুধুমাত্র আমার মামির জীবনটির মতো একটি কাহিনীর খানিকটাও লিখে ফেলতে পারতাম, হয়ত নিজেকে এত অকিঞ্চিতকর মনে হত না।

নানাবাড়িতে আমাদের নানারকম আকর্ষণ ছিল। যেমন, একবার এক মামা নৌকা তৈরি করার কারিগর নিয়ে এলেন। সেই কারিগর একদিনে বেশ চলনসই একটা নৌকা তৈরি করে দিল। আলকাতরা মাখিয়ে শুকিয়ে সেটাকে নিশ্ছিদ্র করার কথা ছিল কিন্তু আমাদের আর তর সইলো না, নৌকাটাকে সেই অবস্থায় পানিতে নামিয়ে ফেললাম, সারা গায়ে আলকাতরা মেখে কিছুক্ষণেই আমাদের চেহারা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেল সত্যি কিন্তু যা মজা হল সেটি বলার মতো নয়। নদীর ঠিক মাঝখানে প্রচণ্ড স্রোতে নৌকা তীরের মতো ছুটছে, আমরা হাল ধরে রেখেছি কিংবা ঝপঝপ বৈঠা ফেলে নৌকা নিয়ে যাচ্ছি, খালের পানিতে কিংবা বিশাল বিলের মধ্যে হাতে বানানো পাল টানিয়ে দিতেই নৌকা ঘুরে গেছে চরকির মতো এবং আমরা সবাই টুপ টুপ করে পানিতে পড়ে কালো গহিন গভীরে ডুবে যাচ্ছি—এইসব স্মৃতিগুলো আমাকে এখনো এত আনন্দ দেয় যে, বুঝানো সম্ভব নয়। আমার সবসময় মনে হয় গ্রামের পথেঘাটে, বনেবাদাড়ে, খালেবিলে এভাবে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতাটুকু না পেলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অংশটুকু অপূর্ণ থেকে যেত। পরিণত বয়সে আমি শিশুকিশোরদের উপন্যাসে যেসব অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখেছি তার বেশিরভাগ এসেছে আমার এই লাগামছাড়া জীবন থেকে।

ছেলেবেলার রঙিন চোখে সবকিছুই রঙিন মনে হত সত্যি কিন্তু পাশাপাশি যে দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তা বা নিষ্ঠুরতা দেখিনি সেটি তো সত্যি নয়। যেমন, স্কুলে যাওয়ার সময় দেখেছি চোর ধরা পড়েছে এবং মানুষজন একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে পেটাচ্ছে। একজনের পরে আরেকজন, সে ক্লান্ত হলে আরেকজন। সবশেষে তার মাথা মুড়িয়ে আলকাতরা মাখিয়ে গলায় জুতোর মালা বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। পিছনে শিশুর দল মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে লাথি ঘুষি কিল মারছে, যখন ইচ্ছে ঢিল মারছে। আমি অবাক হয়ে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, কারো আলকাতরা চুইয়ে লাল রক্ত বের হয়ে আসছে; কী বিচিত্র দেখাচ্ছে তাকে, যেন মানুষ নয়, যেন ভিনগ্রহের কোনো প্রাণী। এতদিন পর সেই নিষ্ঠুরতা নয়, কী আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় সেই নিষ্ঠুরতা দেখতাম সেইটা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝে মৃত্যু দেখেছি। পাশের বাসায় সুস্থ সবল সাঁতারু মানুষটি মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে মারা গেল, ঘটনাটি শুনে আমার তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু খাটিয়াতে করে যখন তার দেহটি নিয়ে আসা হল তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, মানুষটি আর উঠে বসবে না এবং বলা যায় প্রথমবার মৃত্যু ব্যাপারটার অর্থ কী যেন খানিকটা আঁচ করতে পারলাম। এর পরেও পরিচিত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, একবার আমাদের পরিচিত প্রায় আমার সমবয়সী একটি মেয়ে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যা করে ফেলল। উপন্যাসে গল্পে বহুবার এ রকম ঘটনা পড়েছি। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পরিচিত একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে তখন বুঝতে পারি ব্যাপারটি সহজ নয়, এর পিছনে দুঃখ, কষ্ট এবং বিচিত্র রহস্য রয়েছে। হঠাৎ করে ব্যাপারটি গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ছাড়াছাড়াভাবে মৃত্যু দেখার পরও মৃত্যু কিন্তু মোটামুটি অপরিচিত একটি ব্যাপার ছিল। একাত্তরে এসে হঠাৎ ব্যাপারটি কেমন যেন খুব কাছাকাছি একটা ব্যাপার হয়ে গেলো। আমি নিজে তখন ছেলেবেলা পার করে এসেছি কিন্তু যারা তাদের শৈশব একাত্তরের ৯ মাসের সেই ভয়ঙ্কর সময়ের মাঝে পার হয়েছে, তারা না জানি ব্যাপারটা কীভাবে গ্রহণ করেছে। মানুষকে যত অবহেলায় হত্যা করা হয়েছে, অদেরকে তত অবহেলায় হত্যা করা যায় না—এই বোধটা সত্যি আমাদের মধ্যে আছে তো?

লেখার শুরুতে সন্দেহ করেছিলাম ছেলেবেলার কথা লিখতে গিয়ে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কথা লিখে বসে থাকব, লেখা শেষ করে আবিষ্কার করছি সত্যিই তাই করে ফেলেছি। সম্ভবত ছেলেবেলার ব্যাপারটিই এ রকম, মনে করলে পূর্ণাঙ্গ কোনো ছবি ভেসে আসে না, ছাড়াছাড়াভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে। সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা বেদনার সেইসব ঘটনার তীক্ষ্ণ তীব্র ধারালো অংশগুলো সময়ের প্রলেপে মসৃণ হয়ে এসেছে। তাই ছেলেবেলার স্মৃতিতে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, সুখ-দুঃখ যাই হোক না কেন পুরোটুকুই কোমল পুরোটুকুই মধুর।

ভোরের কাগজ
২৯, জানুয়ারি, ১৯৯৮

বইয়ের মেলা এবং মেলার বই

১.

আমি একবার একটি সায়েন্স ফিকশন পড়েছিলাম, যেখানে গল্পকার একটি ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলেছেন যেখানে প্রয়োজন নেই বলে লেখা এবং পড়ার ব্যাপারটি উঠে গেছে। সেই যুগের মানুষ জাদুঘরে আসে 'প্রাচীন' কালে মানুষ কীভাবে 'লিখত' এবং 'পড়ত' সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াটি দেখতে। বই নামক একটা বিচিত্র বস্তু সেখানকার জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা ছিল এবং দর্শকরা অবাক হয়ে পড়া এবং লেখা নামক একটি অনাবশ্যক কাজ কীভাবে করা হত সেটা দেখে এক ধরনের আমোদ পেত।

সায়েন্স ফিকশনটি সম্ভবত লিখেছিলেন, আইজাক আজিমভ—স্মৃতি দুর্বল বলে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। ভালো সায়েন্স ফিকশন লেখক আসলে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও এবং আমার মনে হয় আইজাক আজিমভ এখানে সঠিক অনুমান করেছেন যে, বই নামক ব্যাপারটি আমাদের জীবন থেকে উঠে যাবে। সত্যি কথা বলতে কী, প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সব বইয়ের দোকানে 'অডিও বুকস' নামে জনপ্রিয় বইয়ের ক্যাসেট পাওয়া যায়। সে দেশের মানুষ দীর্ঘ সময় গাড়িতে কাটায় বলে গাড়ি চালানোর মনোযোগ নষ্ট না করেই তারা তাদের প্রিয় বইটি 'শুনতে' পারে। পড়া জিনিসটি এখানে 'শোনা' দিয়ে অপসারিত হয়েছে। বইয়ের লেখায়, অক্ষরের মাঝে ক্রোধ বা ঘৃণা, মায়া মমতা বা ভালবাসার জন্য আলাদা চিহ্ন নেই, কিন্তু ক্যাসেটে যিনি পড়েন তিনি খুব সহজেই কণ্ঠস্বরে আবেগটি শ্রোতাদের মাঝে সঞ্চারিত করে দেন।

তবে ভবিষ্যতে বই জিনিসটি থাকবে না বলে যখন কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেন তখন তিনি মোটেও অডিও ক্যাসেটের কথা ভাবেন না, তিনি ভাবেন কম্পিউটারের কথা। কারো কাছে একটি কম্পিউটার থাকলে তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতো পঁচিশ/তিরিশ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ পাতলা ফিনফিনে একটি দুটি সিডি(CD-Compact Disk) দিয়ে অপসারিত করে দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থে লেখা, ছবি বা চার্ট ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না, সিডির মাঝে শব্দ থাকতে পারে, চলচ্চিত্র থাকতে পারে, ভিডিও ক্লিপ থাকতে পারে, তথ্য খোঁজার বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে পারে, এমনকি যখন খুশি যেকোনো তথ্য প্রিন্ট করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই এনসাইক্লোপিডিয়ার যে উদ্দেশ্য— মানুষকে সব বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা, সেটি একটি বই থেকে অনেক বেশি সফলভাবে করতে পারে এই সিডি। (কয়েকবছর আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর আমার আমেরিকান সহকর্মীরা আমার জন্য নির্ধারিত কম্পিউটারে একটা বাংলা ভাওয়াইয়া গান ঢুকিয়ে রেখেছিল, সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু আলোকচিত্র-সবকিছু নিয়েছিল একটি এনসাইক্লোপিডিয়া সিডি থেকে)।

পৃথিবীর সকল মানুষের হাতে যেদিন কম্পিউটার বা কম্পিউটার জাতীয় একটি যন্ত্র পৌঁছে যাবে, আমি মোটামুটি নিশ্চিত, সেদিন থেকে 'কাগজ' নামক একটি বিশেষ

www.BanglaBook.org

বস্তুতে যেভাবে 'ছাপা' নামক প্রক্রিয়ায় লেখা হয় সেটি এই পৃথিবী থেকে উঠে যেতে শুরু করবে। কাগজের বই অপসারিত হবে ইলেকট্রানিক বই দিয়ে। আমাদের মনে হতে পারে বই অপসারিত হলেও লেখা এবং পড়া এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চয়ই থাকবে, কোনো তথ্যকে সংরক্ষণ করতে হলেই সেটিকে কোথাও না কোথাও কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই লিখতে হবে, আর সেই তথ্যকে জানতে হলে কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই সেটা পড়তে হবে। আইজাক আজিমভ অনুমান করেছেন সেটি সত্যি নয়, লেখা এবং পড়া হয় যে প্রয়োজনে সেই প্রয়োজন যদি অন্যভাবে মিটে যায়, তাহলে লেখা এবং পড়ার প্রয়োজনও থাকবে না। এই মুহূর্তে আমার কম্পিউটারে লেখা জিনিস পড়ে শোনাতে পারে সেরকম সফটওয়ার রয়েছে। ইন্টারনেটে খানিকক্ষণ নির্ভেজাল যোগাযোগের সময় পেলে আমি আইবিএম-এর ওয়েব সাইট থেকে উচ্চারণকে লিপিবদ্ধ করার একটি সফটওয়ার ডাইনলোড করতে পারি যেটি আমার কথা শুনে সেটি লিখে দেবে। মানুষের লেখা এবং পড়ার ক্ষমতাটুকু কৌশলী একটি যন্ত্র দিয়ে করার কাজ শুরু হয়ে গেছে, দিনে দিনে সেটি আরো নিপুণভাবে করা হবে। একদিন সেটি এত নিপুণভাবে করা হবে যে, একজন মানুষকে আর নিজের হাতে করতে হবে না—লেখা জিনিসটি কী আমাদের জানতে হবে না, পড়া জিনিসটি আমরা পুরোপুরি ভুলে যাব। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একটা বিশাল বিজয় বলে বিবেচনা করা হবে, কিন্তু আমি ব্যাপারটি চিন্তা করে বুকের ভিতরে একটি গভীর বেদনা অনুভব করি। মানুষ থাকবে কিন্তু লেখা এবং পড়া থাকবে না-সেটি কী করে সম্ভব?

২.

লেখা এবং পড়া ব্যাপারটি আমরা এত সহজে করি বলে হয়ত ব্যাপরটার গুরুত্বটা সবসময় অনুভব করি না। যিনি লিখেন তিনি কাগজে কিছু দুর্বোধ্য আঁকিবুকি করেন, যারা পড়তে পারেন তাদের কাছে সেই দুর্বোধ্য আঁকিবুকি, সেই বিচিত্র দাগ এবং চিহ্ন অর্থবহ হয়ে উঠে। একজন লেখক সেই বিমূর্ত চিহ্ন দিয়ে তার মনের কথা, তার স্বপ্ন, কল্পনা, তার ক্রোধ, ভালবাসা আরেকজনের মাঝে সঞ্চারিত করে দেন। আমাদের মনের ভাব আমরা কথা বলে প্রকাশ করতে পারি—অন্য একজন সেটা শুনে অনুভব করে নেয়। ব্যাপারটি দেখিয়েও করা সম্ভব—একই সঙ্গে দেখিয়ে এবং শুনিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বইয়ে এই ব্যাপারটি করা হয় একটি অত্যন্ত abstract বা বিমূর্ত উপায়ে। লেখালেখির এই ব্যাপারটি—একজনের চেতনা থেকে কিছু তথ্য একটি বিমূর্ত উপায়ে অন্য একজনের চেতনায় সঞ্চারিত হওয়ার ব্যাপারটি—মানুষের একেবারে নিজস্ব। লেখা নামক বিমূর্ত একটি বিষয়কে মস্তিষ্কে মূর্ত করে তোলার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত পরিশীলিত, জটিল এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতি। মানুষের উপভোগ করার যে কয়টি ব্যাপার আছে তার মাঝে এর সঙ্গে অন্য কোনো পদ্ধতির তুলনা হয় না। কম্পিউটার নামক কৌশলী এক যন্ত্র এসে এক সময় মানুষের এই পরিশীলিত চিন্তা পদ্ধতিকে অপ্রয়োজনীয় করে দেবে, সেটি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

এই মুহূর্তে বইয়ের শত্রু কিন্তু কম্পিউটার নয়, বই প্রকাশনার একটি অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি অনেক সহজ করে দিয়েছে। কম্পিউটারে বই

কম্পোজ করা, সেটাকে সাজানো গোছানো, সম্পাদনা করা, তার প্রচ্ছদ আঁকা, অলঙ্করণ করা—সবকিছু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করা যায়। এই মুহূর্তে কম্পিউটার বইয়ের পরম মিত্র-এই মুহূর্তে বইয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে টেলিভিশন! টেলিভিশন আমার প্রিয় বস্তু নয়। সত্যি কথা বলতে কি ছবি এবং শব্দ ব্যবহার করে এই যন্ত্রটি যখন খুশি তখন আমার মনোযোগ পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারে বলে আমি এটাকে খানিকটা ভয় পাই। কোনো কিছু পড়ার সময় যখন চমৎকার একটা লাইন চোখে পড়ে তখন আমি থেমে যেতে পারি, আমি সেটা মাথার মাঝে নাড়াচাড়া করতে পারি, অন্য একজনের সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি। টেলিভিশনে সেটা সম্ভব নয়। তার গতি আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে, সেটা দেখতে হয় তাদের গতিতে। পৃথিবীর মানুষের সময়ের সবচেয়ে বড় অংশটি কেড়ে নিয়েছে টেলিভিশন। আমাদের মতো হত দরিদ্র দেশেও এখন ঘরে ঘরে ডিশ এন্টেনা, পৃথিবীর কত চমৎকার অনুষ্ঠান থাকার পরও এ দেশের মানুষের হাতে জোর করে তুলে দেওয়া হচ্ছে হিন্দি অনুষ্ঠান টেলিভিশনের মাঝে দিয়ে হিন্দি কালচার এমনভাবে আমাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে যে মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে বুঝি আমাদের মুক্তি নেই। বাংলাদেশ বিমানের প্লেনটিকে হাওরে নামিয়ে দেওয়ার আগে আমি অনেকবার প্লেনে যাতায়াত করেছি, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক বাংলাদেশ বিমানের ডোমেস্টিক লাউঞ্জে আমাকে দীর্ঘসময় সময় কাটাতে হয়েছে। সেই লাউঞ্জে একটি টেলিভিশন রাখা আছে এবং আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, সেখানেও চব্বিশ ঘন্টা হিন্দি প্রোগ্রাম দেখানো হয়—একটা স্বাধীন দেশের বিমানবন্দরে সেই দেশের মানুষকে কেন হিন্দি প্রোগ্রাম দেখতে হবে, সেই প্রশ্নটি কোথায় করা যায় আমি এখনো ভেবে বের করতে পারিনি।

বই দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সঙ্গে আছে—টেলিভিশন জিনিসটি তুলনামূলকভাবে নতুন। টেলিভিশনের নতুনত্বটি কেটে যাওয়ার পর মাত্র কিছুদিন হল বই পড়ার সঙ্গে এর মূল পার্থক্যটি সবাই বুঝতে শিখেছে। পাশ্চাত্য দেশগুলো—যারা গোড়াতে এই টেলিভিশন-মহামারী শুরু করেছে—তারাই এখন স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের টেলিভিশনের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য জীবনপণ যুদ্ধ শুরু করেছে। তবে সেটি বড় অসম যুদ্ধ, টেলিভিশনের হাতে একবার যাকে সমর্পণ করা হয়েছে তাকে শব্দ-রঙ-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-উত্তেজনার জগৎ থেকে বইয়ের কাগজে বিমূর্ত কিছু চিহ্নের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কল্পনার কোমল একটা জগতে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ একটা ব্যাপার নয়। শৈশবে যখন গ্রিক পুরাণে হারকিউলিসের গল্প পড়েছি তখন কল্পনায় সেই অসীম শক্তিধর বীরের ছবি, তার বীরত্বগাথা, পুরাণের দেবদেবী দৈত্য-দানো সুন্দরীদের কল্পনা করে নিয়েছি। ইদানীং টেলিভিশনে হারকিউলিসের উপরে একটি সিরিজ দেখানো হয়, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কমবয়সীদের বুদ্ধিমত্তার উপযোগী, তাই অসংখ্য শিশু এই অনুষ্ঠানটি দেখে-তাদের কারো মনে কিন্তু গ্রিক পুরাণের সেই রহস্যময় জগতের কল্পনার ছবি ভেসে ওঠে না! তাদেরকে সরাসরি কিছু আমেরিকান মানুষকে আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলিয়ে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের খুঁটিনাটি দিয়ে সাজিয়ে গ্রিক ধরনের নামের কিছু চরিত্র দিয়ে বর্তমান যুগের কিছু চমকপ্রদ কাহিনী

www.BanglaBook.org

দেখানো হয়। যারা সেই অনুষ্ঠানটি দেখে, তারা গ্রিক পুরাণের সেই বিচিত্র কাহিনীর রহস্যময় জগতকে কল্পনা করার আনন্দটি কোনোদিন অনুভব করবে না ভেবে আমি সবসময় এক ধরনের বেদনা অনুভব করেছি।

৩.

বইপত্রে লেখালেখির প্রায় পুরোটুকুই করা হয় সাদা কাগজে কালো ছাপা দিয়ে, আমাদের প্রায় বেশিরভাগ মানুষের সেটি পড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু অল্প কিছু মানুষ রয়েছে যাদের মস্তিষ্ক এই লেখাগুলো গ্রহণ করতে পারে না। কোনো লেখা দেখলে তাদের মনে হয় অক্ষরগুলো উল্টে গেছে। কখনো কখনো মনে হয় কিলবিল করে নড়ছে, উল্টেপাল্টে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের এই অবস্থার নাম ডিসলেক্সিয়া (dyslexia)। যাদের গুরুতর ডিসলেক্সিয়া রয়েছে তাদের অনেকে-আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেও-পুরোপুরি নিরক্ষর হয়ে বাড় হওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকে না। আমাদের আশপাশে অনেক সময় কিছু শিশু-কিশোরকে দেখি যারা অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং কৌতূহলী কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে তারা পাঠ্য পুস্তকে পুরোপুরি অনাগ্রহী। কিছুদিন আগেও ঐ শিশুদের অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী বলে পুরোপুরিভাবে বাতিল করে দেওয়া হত। কিন্তু ইদানীং দেখা গেছে তাদের একটা বড় অংশ আসলে ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত। আলোর রঙ পাল্টে, বিশেষ চশমা ব্যবহার করে কখনো কখনো কারো কারো ডিসলেক্সিয়া দূর করে দিয়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকেরা আবিষ্কার করেছেন, যে ছেলেটিকে সবসময় অমনোযোগী দুষ্টু ছেলে হিসেবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে আসলে সে মোটেও অমনোযোগী এবং দুষ্টু ছেলে নয়, প্রকৃতির কোনো এক রহস্যময় কারণে তারা কখনো পড়তে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, বুদ্ধিমান এবং কৌতূহলী, সচেতন এবং সংস্কৃতিবান, কখনো কখনো বড় নেতা, এবং পড়াশোনা করার সবরকম সুযোগ পাওয়ার পরেও তারা পুরোপুরি নিরক্ষর ছিলেন—মোগল বাদশাহ আকবর এরকম একটি উদাহরণ। আমার ধারণা তারা সম্ভবত ডিসলেক্সিয়া-আক্রান্ত ছিলেন, ইতিহাসের পুরোনো পৃষ্ঠা ঘেঁটে সেটা সম্ভবত এখন আর কেউই বের করতে পারবে না।

৪.

ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত অল্প কিছু মানুষের কথা ছেড়ে দিলে পৃথিবীর বাকি মানুষের জন্য বইয়ের মতো চমৎকার কোনো ব্যাপার হতে পারে না। পড়া শেখার আগে বইয়ের ছবি দেখে তার পিছনে কি রহস্য আছে ভেবে রোমাঞ্চিত হয়েছি, পড়তে শেখার পর গল্পের কাহিনীটুকুতে নিজের কল্পনা মিশিয়ে একটি রহস্যময় জগৎ তৈরি করে নিয়েছি। ধীরে ধীরে বয়স বেড়েছে, এক সময় যে সকল বই থেকে শত হস্ত দূরে দূরে থাকতাম, এখন সাগ্রহে সেসব বই খুঁজে বেড়াই। মজার কথা হচ্ছে যখন সত্যি সত্যি ইতিহাস, সমাজনীতি সাহিত্যের বিশ্লেষণ বা গবেষণামূলক বই খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছি তখন হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছি, আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশনার জগতে একটা ভয়ঙ্কর দৈন্যদশা চলছে। একুশের বইমেলায় অনেক আগ্রহ নিয়ে

একটির পর একটি বইয়ের স্টল ঘুরে দেখি অজস্র চকচকে মলাটের 'কথা সাহিত্য' কিন্তু সেগুলো কথারই সাহিত্য—তার বেশি কিছু নয়। অনেক খাটাখাটুনি করে, গবেষণা করে, চিন্তাভাবনা করে মানুষ যেসব বই লেখে সেগুলো কোথায়? পৃথিবীতে কতো বিচিত্র বিষয় রয়েছে, কেউ কি সেসব বিষয়ে গবেষণা করে বই লিখতে পারে না? আমার জানার খুব ইচ্ছে। যেসব বিষয়ে বই পড়ার আমার খুব ইচ্ছে কিন্তু কোথাও সেরকম বই দেখিনি তার কয়েকটা উদাহরণ দিই : এক পুরুষ আগেও আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত পুরুষ মানুষেরা তাদের বাড়ির দাসী-বাঁদিদের বিয়ে করে ফেলতেন, কেন এটা করতেন, কীভাবে করতেন, তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল, কেউ বলতে পারবে? গত দুই যুগ পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিই কী ঘটেছিল। কিছুদিন আগে চা বাগানে একজন ম্যানেজারকে চা শ্রমিকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, তার আগে এবং পরে বেশ কিছু শ্রমিক সেখানে আত্মহত্যা করেছে—শ্রমিকদের মাঝে প্রকৃত পরিবেশটি কী? কোনো কোনো এলাকার মানুষ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আত্মহত্যা করে, তার প্রকৃত কারণটি কী? একদিন রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছি হঠাৎ দেখলাম কিছু মানুষ, তারা নাকি পানিতে ডুবে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে বের করে—বাংলাদেশে এরকম আর কি কি বিচিত্র পেশা রয়েছে? অতীতে কি কি ছিল? মানুষের কানে চুল নাকি হয় ওয়াই ক্রমোজমের কারণে—সারা পৃথিবীতে কানে চুলের মানুষ একেবারে নেই, কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য—কারণ কি?

আমি সারা মেলা ঘুরে ঘুরে এ রকম বিচিত্র বই খুঁজে বেরিয়েছি, পাইনি। লেমিনেটিং করা চমৎকার সব বই রয়েছে—বেশিরভাগই ভালবাসার বই, পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই বইয়ের নামেই 'ভালবাসা' কথাটি হা-বিতং করে লেখা!

আমাদের দেশে খাটাখাটুনি করে গবেষণাধর্মী বই লেখার মানুষ নেই, সেটি সত্যি নয়। দেশে শিক্ষিত মানুষ কম, যারা আছেন তাদের শখ থাকলেও বই কেনার আর্থিক সঙ্গতি নেই বলে এই ধরনের পাঠকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত—কাজেই ইচ্ছে করলেও প্রকাশকেরা এই ধরনের বই প্রকাশ করতে পারে না।

অথচ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হতে পারত। আমাদের দেশে এখন যে রকম মোড়ে মোড়ে ভিডিওর দোকান। সে রকম মোড়ে মোড়ে বইয়ের লাইব্রেরি থাকতে পারত। ১০০ টাকা দিয়ে যে বই কিনতে হয়, মোড়ের লাইব্রেরি থেকে এক টাকায় সেই বই এনে পড়তে পারতাম। নতুন কোনো বই প্রকাশিত হলেই সারা দেশের অসংখ্য লাইব্রেরি সেই বই কিনে নিতে পারত-প্রকাশকরা জানত চোখ বুঁজে তারা যেকোনো বই কয়েক হাজার কপি বিক্রি করে ফেলতে পারবে, গবেষণা ধর্মী বই প্রকাশ করতে তারা আর ভয় পেত না। প্রেমের উপন্যাস আমাদের আর এ রকম উৎপাত করত না। দেশের সরকার, নানা ধরনের এনজিও মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে—দেশের মানুষের মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এখন কি গ্রামে গ্রামে একটা করে লাইব্রেরি গড়ে তুলতে পারে না? বেশ কিছুদিন আগে বই মেলায় একজন কিশোর যখন খুব উৎসাহ নিয়ে আমার একটি বইয়ে অটোগ্রাফ নিচ্ছে তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার মা শুকনো মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বইয়ের ভীষণ দাম! একেবারে তো সর্বস্বান্ত হয়ে যাব।'

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি খুব সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবা-মাকে নতুন জামা-কাপড় কেনার জন্য চাপ দেওয়া যে রকম বখে যাওয়া সন্তানের লক্ষণ, বই কিনে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়াও তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যে ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষমতা তার তুলনায় বইয়ের দাম অত্যন্ত বেশি। তার পরেও এ দেশের মানুষ বইমেলা উপলক্ষে এত বই কিনে দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আমি প্রকাশকদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছি—তারা আমাকে জানিয়েছেন, মানুষজন যখন এই দামেও বই কিনছেন সেটি নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়! তবুও আমি মোটামুটি নিশ্চিত—বইয়ের ভিতরে যে মূল্যটি লেখা হয়, বইয়ের প্রকৃত মূল্য তার থেকে অনেক কম। বই বাজারজাত করার নানা ধরনের প্রক্রিয়ায়, নানা আকারের কমিশন দেওয়ার পর পাঠকদের খানিকটা বাধ্য হয়ে একটু বেশি মূল্য দিতে হয়। আমাদের দরিদ্র দেশের শিক্ষিত মানুষদের বই কেনার ব্যাপারে সরকার সম্ভবত একটা ভূমিকা রাখতে পারে। এই দেশে প্রকাশনাকে এখনো একটা শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, যদি সত্যিকার অর্থে এটিকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হত, আমি নিশ্চিত—তাহলে এদেশে সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল প্রকাশনার একটি ছোটখাটো বিপ্লব ঘটে যেতে পারত।

বাংলা একাডেমীর বইমেলায় একজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মেলাটি কেমন লাগছে—উত্তরে আমি বলেছিলাম, খুব ভালো লাগছে কারণ মেলা ছাড়া আর কখনো এত বই আমি এক সঙ্গে দেখতে পাই না। এটি কিন্তু আমার মন্তব্য নয়, এটি হচ্ছে আমার অভিযোগ। বইমেলা শেষ হয়ে যাবে, তখন হঠাৎ করে এই দেশের প্রকাশিত ১২ হাজার বই অদৃশ্য হয়ে যাবে (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের ঢাকা বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় এই দেশের বইয়ের সংখ্যা ১২ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে বলে শুনেছি)। তখন আমি যদি বই কেনার জন্য কোনো বইয়ের দোকানে যাই সেখানে একেবারে হাতে গোনা কয়েকজন লেখকের বহুল প্রচলিত কয়েকটা বই ছাড়া আমি একটা বইও খুঁজে পাব না। এর থেকে গভীর দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

আমি আমার জীবনের একটা বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে এখনো একটি জিনিসের অভাবে অভ্যস্ত হতে পারছি না—সেটি হচ্ছে চমৎকার একটি বইয়ের দোকান। যে দোকানে বাংলাদেশের সকল প্রকাশিত বই শেলফে সাজানো থাকবে, আমরা ঘুরে ঘুরে সেখানে বই নেড়ে চেড়ে দেখতে পারব, ইচ্ছে হলে কিনতে পারব। গুটি কতক লেখকের গুটি কতক জনপ্রিয় বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই কিনতে হলে আমাকে আর একুশের বইমেলার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। মানুষ যেমন করে বিনোদনের জন্য নাটক দেখতে যায়, চলচ্চিত্র দেখতে যায়, যেমন করে সঙ্গীতানুষ্ঠানে বা জাদুঘরে যায়, ঠিক তেমনি করে আমরা সেই বইয়ের দোকানে যাব।

একটি বই তো আসলে শুধু একটি বই নয়, সেটি হচ্ছে একজন লেখকের চেতনা, তার স্বপ্ন, তার হৃদয়ের স্পর্শ।

ভোরের কাগজ
শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

আলতা এবং তানিয়ারা—(এক)

আমার বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ছোট পথটুকুর মাঝামাঝি একটি ট্যাপ থেকে সব সময় ঝির ঝির করে পানি বের হত। ট্যাপের এই পানিটি ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিষ্কার পানির খুব অভাব ছিল বলে এই পানির ধারাটি ছিল বহুল ব্যবহৃত। আশপাশে শিক্ষক-শিক্ষিকার বাসায়, মেয়েদের হলে খাবার পানি হিসেবে এই ট্যাপের পানি নেওয়া হত। পানি টানাটানির এই সার্বক্ষণিক কাজে সারাক্ষণ লেগে থাকত বাচ্চা বাচ্চা কয়টি মেয়ে। আমাদের দেশের কবি এবং শিল্পীরা মেয়েদের কলসি কাঁখে করে পানি আনার ব্যাপারটি খুব সুন্দর এবং কমনীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন কিন্তু আসলে কাজটি কমনীয় বা সুন্দর নয়—এটি অসহ্য পরিশ্রমের কাজ। পানির স্পেসেফিক গ্র্যাভিটি অনেক বেশি। অল্প একটু পানিরই ওজন অনেকখানি। কাজেই আমি ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েগুলোকে কলসি কাঁখে পানি টেনে নিয়ে যেতে দেখে তার মাঝে কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পেতাম না। এই বয়সী বাচ্চাদের জন্য আমি কিছু লেখালেখি করেছি, আমার খানিকটা পরিচিতিও হয়েছে কিন্তু পানি টানা এই বাচ্চাগুলো আমার সেই পরিচয় জানে না। তারা স্কুলে যায় না, লেখাপড়া করে না, কখনো কোনো বই পড়ে না তবুও তাদের সঙ্গে আমার খানিকটা পরিচয় আছে। পানি টেনে নিতে নিতে হঠাৎ আমাকে দেখলে তারা দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখের সবগুলো দাঁত বের করে হেসে স্যালুট করার মতো ভঙ্গি করে সালাম দেয়। আমি হাসিমুখে সালাম নিয়ে তাদের সঙ্গে একটি-দুটি কথা বলি, তারা সামনে থেকে চলে গেলে আমি গোপনে নিজের ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলি। বাচ্চাগুলো হতদরিদ্র, এই বয়সে যখন স্কুলে যাওয়ার কথা, হইহুল্লোড় করার কথা তখন অল্প কিছু অর্থের জন্য জীবনপণ করে কাজ করতে হয়—আমি সেজন্য গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি না, আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি কারণ ছোট ফুটফুটে মেয়েগুলোর অপূর্ব মায়া কাড়া চেহারা আমি জানি দরিদ্র পরিবারের ফুটফুটে মায়াকাড়া চেহারা একটি বড় অভিশাপ। বছর খানেকের মাঝে মেয়েগুলো আরো একটু বড় হয়েছে। এদের মাঝে সবচেয়ে যে হাসিখুশি তার নাম আলতা। আমার সঙ্গে দেখা হলেই হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়। এই বয়সী মেয়েদের যা করার শখ তার মাঝেও এর ব্যতিক্রম নেই। পানি টেনে আনতে আনতে মাঝেমাঝেই সে খানিকটা সাজগোজ করে, ঠোঁটে একটু রঙ, গালে একটু পাউডার। আমি বিশ্ববিদ্যালয় যেতে যেতে আলতার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে আমার স্ত্রীকে বলেছি, 'আহা! এমন মায়াকাড়া চেহারা—মেয়েটার কপালে না জানি কি দুঃখ আছে।' আমার কথাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই কি না জানি না একদিন খবর পেলাম আলতা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার জীবনে আমি যতগুলো ব্যাপারে বড় রকম আঘাত পেয়েছি এটি তার মাঝে একটা। এই ছোট মেয়েটার জীবনে কি দুঃখ ছিল আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যদি আমি আগে

থেকে জানতাম তাহলে তাকে সেই দুঃখ থেকে রক্ষা করার মতো অর্থ, বিত্ত বা ক্ষমতা আমার ছিল। কিন্তু সেই ছোট মেয়েটি আমাকে বা পৃথিবীর কাউকেই তার দুঃখটির কথা জানায়নি, সমস্ত পৃথিবীর প্রতি একটা গভীর অভিমান নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে এই পৃথিবীতে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ এবং একাকী, তার দুঃখের কথা, অভিমানের কথা শোনার কেউ নেই, জীবনের বঞ্চনাকে নিয়ে অভিযোগ করার কেউ নেই, কথাটি চিন্তা করে এতদিন পরেও আমি কেন জানি নিজের ভিতরে তীব্র অপরাধবোধ অনুভব করি।

২.

এই দেশে আলতারা একা নয়। শুধু দেশ নয়, আমার কাছাকাছি যে ছোট জগৎ সেখানেও আলতারা একা নয়। আলতার সঙ্গে আরো একটি ছোট মেয়ে কলসি কাঁখে পানি টেনে নিত, অনেকদিন তাকে দেখিনি। গত সপ্তাহে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, মেয়েটি এখনো পুরোপুরি কিশোরী হয়ে ওঠেনি। এরই মাঝে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তিনটি ঘটে গেছে, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, তার একটি সন্তান হয়েছে এবং তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম তার এই জীবনের তিন তিনটি ঘটনার কোনোটিরই গুরুত্ব সে ধরতে পারছে না। সুস্থ-সবল সন্তানটিকে কোলে নিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, স্বামী ছেড়ে যাওয়ার কথাটি বলে আমাকে হতবাক করে দিতে পেরে তার মুখে হালকা এক ধরনের গর্বের ভাব ফুটে উঠল। ফুটফুটে মেয়েটির চেহারার লাবণ্যের কিছু অবশিষ্ট নেই, মনে হয় তার সুস্থ-সবল সন্তানটি এই অপরিণত বয়সের মায়ের দেহ থেকে সকল জীবনী শক্তি শুষে নিয়েছে। মেয়েটির শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম আলতার মতো তার জীবনটিও আসলে শেষ হয়ে গেছে, দৈহিকভাবে বেঁচে আছে এইটুকুই যা পার্থক্য।

আমি আজীবন বিজ্ঞান চর্চা করে এসেছি, বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে আমার যে কাজটি সবচেয়ে বেশি করতে হয়েছে সেটি হচ্ছে অসংখ্য তথ্য থেকে তার পিছনের কারণটি, অন্তর্নিহিত সত্যটি খুঁজে বের করা। আমি জানি একটি দুটি ঘটনা দেখে তার পিছনের সত্যটি আবিষ্কার করার চেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত কাজ নয়। 'ডেকচির একটি ভাত টিপলেই পুরো ডেকচির ভাতের খবর বোঝা যায়' এই পদ্ধতিটি ভাত রান্না করা ছাড়া আর কোথাও ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমার দেখা দুটি মাত্র মেয়েকে দিয়ে দেশের সকল মেয়ের দুঃখ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। হয়ত দেশের অন্য মেয়েরা এত দুঃখী নয়, আমি যে দুটি মেয়েকে দেখেছি সেটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিংবা কে জানে হয়ত উল্টোটাই সত্যি, দেশের মেয়েদের দুঃখ আরো অনেক তীব্র, আমি শুধু পানিতে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়োটুকু দেখছি। প্রকৃত সত্যি বের করার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন, আমি সমাজবিজ্ঞানী নই তাই আমার কাছে সেই পরিসংখ্যান নেই। খবরের কাগজে প্রতিদিন রেপ (আমি কেন জানি এর বাংলা প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে পারি না), ফতোয়াবাজি এবং যৌতুকের জন্য নির্যাতনের

অসংখ্য খবর ছাপা হয়, মনে হয় আজকাল এই ধরনের খবরগুলো ছাপা হয় অনেক বেশি। এর দুরকম অর্থ হতে পারে। এক, সত্যিসত্যিই দেশে এই অপরাধগুলো বেড়ে গেছে কিংবা দুই, আসলে সেরকম বেড়ে যায়নি মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়েছে বলে খবরের কাগজে বেশি প্রকাশিত হচ্ছে। কোনটি সত্যি সেটি বের করার জন্যে পরিসংখ্যান নিতে হয়, অসংখ্য তথ্য নিয়ে সেটি গ্রাফে বসাতে হয়, ছক করতে হয়, সেগুলো বিশ্লেষণ করতে হয় তখন তার ভিতর থেকে একটি সত্যি বের হয়ে আসে। হয়ত দেখা যাবে আমরা একটি সর্বনাশা সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিংবা কে জানে হয়ত দেখব খবরের কাগজের নৈরাশ্যজনক সংবাদগুলোর পিছনে আশার আলো ঠিক ঠিক করছে। হয়ত আমরা ধীরে ধীরে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তুলছি-কোনটি সত্যি সেটি বের করার জন্য প্রয়োজন তথ্য এবং পরিসংখ্যানের। একটি ঘটনা দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়—পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

৪.

কিন্তু কখনো কখনো একটি ঘটনাই সমস্ত দেশের বিবেককে কলসে দেয়। সমস্ত পরিসংখ্যান, সমস্ত তথ্য, বিশ্লেষণকে ছাপিয়ে আমাদের ক্রোধ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হয়। এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে গত ১৩ তারিখ আদালতের পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। তানিয়া নামের পাঁচ বছরের একটি শিশুকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে মানবতার সবচেয়ে নৃশংসতম নির্যাতনের শিকার হতে হল। এই একটি ঘটনা আজ আমাদের বিবেককে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আমরা জানি আমাদের দেশটি দরিদ্র, এই দেশের অনেক মানুষের মাথার উপরে ছাদ নেই, শীতের দিনে শীতবস্ত্র নেই, অনেক শিশু অভুক্ত থেকে ঘুমাতে যায় কিন্তু তবু আমাদের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অহঙ্কার ছিল, আমরা সব সময়ে ভেবেছি আমরা একটি সভ্য জাতি। কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের সেই অহঙ্কার যেন ছোট খেয়ে গেল। জাতি হিসেবে আমরা কি বোধ শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি? যে পুলিশবাহিনী আমাদের অন্যায়-অবিচার থেকে রক্ষা করবে সেই পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কেমন করে পাঁচ বছরের একটি অবোধ শিশুকে রেপ করা হয়? যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন যেরকম ন্যায় এবং সত্য থাকবে ঠিক সেরকম অন্যায় অসত্য এবং অপরাধ থাকবে। কিন্তু সেই অন্যায় অসত্য এবং অপরাধের বিরোধী একটি শক্তি থাকতে হবে, পুলিশ হচ্ছে সেই শক্তি, এই পুলিশবাহিনীর কারণেই যদি তানিয়ারা নির্যাতিত হয় আমরা কার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাব?

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন, আমি জানি আমাদের দেশের পুলিশ যদি 'সত্যি সত্যি' চায় তাহলে যেকোনো অপরাধীকে ধরে ফেলতে পারে। তানিয়ার নৃশংস ঘটনার পর পুলিশ সেই অপরাধীকে ধরতে পারছে না জেনে (আমি যখন এটি লিখছি তখনো পারেনি) আমার বুক কেঁপে উঠছে, আমার মনে হচ্ছে এখানেও কি সেই ইয়াসমিন হত্যা জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে? পুলিশ কি সত্যি ধরতে পারছে না, নাকি অপরাধী ধরা হলে অব্যবস্থার যে ছবিটি বের হয়ে আসবে

www.BanglaBook.org

সেটি এত নিদারুণ যে, সেটি সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই বলে অপরাধীকে ধরার জন্য শক্তি নিয়োগ করছে না?

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন বলে আমি সব সময় পুলিশের সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছি। আমি বাচ্চাদের জন্য লেখালেখি করি—সেখানে মাঝেমাঝেই পুলিশের চরিত্র এসেছে এবং আমি তাদেরকে আমার বাবার মতো সৎ, নির্লোভ, সদালাপী, বুদ্ধিমান এবং আন্তরিক মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছি। আমার বাবা এখন আর বেঁচে নেই, পুলিশের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমার চারপাশে এখন আমি একটি বিচিত্র পুলিশের জগৎ আবিষ্কার করেছি, তারা শুধু ইয়াসমিন হত্যা, সীমা হত্যার চরিত্র নয়, থানা হাজতে জুতার ফিতা দিয়ে আত্মহত্যার বিচিত্র ঘটনার নায়ক নয়—তারা রাজনৈতিক নেতাদের আজ্ঞাবহ অনুচর। আমি জানি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি ভায়োলেন্সে আটকা পড়ে গেলে আমি যদি সঠিক রাজনৈতিক দলে না থাকি আমাকে সাহায্য করার জন্য কোনো পুলিশ এগিয়ে আসবে না। পথে ঘাটে পুলিশ দেখলে এই দেশের সাধারণ মানুষের মতো আমিও আর নিরাপদ বোধ করি না, অজানা আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠে।

আমি এখনো বাচ্চাদের জন্য লিখি, আমার বইয়ে এখনো পুলিশের চরিত্র উঠে আসে, সেই চরিত্রগুলো আর নির্লোভ এবং সৎ নয়। তারা অসৎ ধূর্ত, লোভী এবং নিষ্ঠুর—আমার চারপাশে আমি যেরকম দেখি। একজন অসৎ ব্যবসায়ী থাকতে পারে, রাজনীতিবিদ থাকতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কিংবা আমলাও থাকতে পারে, সেই সমাজ তবু টিকে থাকতে পারে কিন্তু যে সমাজে পুলিশ বাহিনী অসৎ সেই সমাজের কোনো অস্তিত্ব নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে করে একটি দেশ টিকে থাকতে পারে না।

৫.

মনে করা যাক এই লেখাটি প্রকাশ হওয়ার আগেই পুলিশ তানিয়া নামের সেই মিষ্টি শিশুটির ওপর অমানুষিক অত্যাচারকারী বিকৃত মনের সেই অসুস্থ মানুষটিকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। তাহলে কি আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব?

আমি নিশ্চিত সবাই আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে, আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। এই অপরাধী একজন নয়, তানিয়ার ঘটনা পুরনো হওয়ার আগেই ঠিক এই রকম আরো একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা খবরের কাগজে এসেছে। এবারের মেয়েটির বয়স আরো কম-চার বছর। (বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রিক-ঘটনাটি ঢাকা শহরে ঘটেনি বলে এই অমানুষিক ঘটনাটি তানিয়ার ঘটনাটির মতো সমানসংখ্যক মন্ত্রী, নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি) শুধু যে শিশুদের নিয়ে ঘটছে তাই নয়, প্রতিনিয়ত বালিকাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, কিশোরী-তরুণী এমনকি বয়স্ক মহিলারাও বাদ যাচ্ছে না। কিন্তু আমি সমাজবিজ্ঞানী নই বলে আমার কাছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু

আমি এটুকু জানি যে, এ ধরনের প্রতিটি ঘটনা যেটি খবরের কাগজ পর্যন্ত এসেছে তার পিছনে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে নির্যাতিত শিশু, বালিকা-তরুণী এবং মহিলারা, তাদের আপনজনেরা বুকে পাথর চেপে সেই দুঃখ লজ্জা অপমান এবং আতঙ্ক সহ্য করে।

কেন এ রকম ঘটছে? আমি জানি মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন রেপ নামক ব্যাপারটির সঙ্গে সেক্স-এর সম্পর্ক নেই, এটি সরাসরি ভায়োলেন্স (আমি আবার স্বীকার করছি—কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আমি ব্যবহার করতে পারি না) ভায়োলেন্স ঘটানোর জন্য মানুষেরা বেছে নেয় দুর্বল কিছুকে। শুধু দুর্বল নয়, সে যদি নিকৃষ্ট হয় তাহলে আরো ভালো হয়। একাত্তরে 'খাঁটি মুসলমান' পাকিস্তানিদের তাই 'হিন্দুখেঁকো' বাঙালিদের হত্যা করা এত সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসিরা কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই ইহুদিদের হত্যা করেছিল, জাপানিরা হত্যা করেছিল চাইনীজদের। ঠিক সেরকমভাবে আমাদের সমাজে মেয়েদের ছেলেদের থেকে নিকৃষ্ট প্রজাতি হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এটি হঠাৎ করে ঘটেনি, যুগ যুগ ধরে এই অভ্যাস পড়ে উঠেছে, শুধু যে পুরুষেরা এটি বিশ্বাস করতে শিখেছে তাই নয়, অনেক জায়গায় মেয়েরাও সেটা মেনে নিয়েছে। আমার পরিচিত বাসায় কাজকর্মে সাহায্যকারী একটি মহিলা যৌতুকের পুরো টাকা দিতে পারেনি বলে তার পুত্রকে আদেশ দিয়েছে পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করার জন্য। ঘটনাটি জানতে পেরে আমার পরিচিতরা সেই যৌতুকের টাকাটা দিয়ে বিয়েটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কাজের মহিলা রাজি হয়নি। সে সবিনয় জানিয়েছে অন্য কেউ দিলে হবে না—পুত্রবধূর পরিবারকেই সেই অর্থ দিতে হবে, একটি বিবাহোপযোগী ছেলে ফ্যালনা নয়। সবার আন্তরিক চেষ্টার পরও পরীর মতো সেই মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে ছেলেটি আবার নতুন করে বিয়ে করেছে। এই ঘটনায় নৃশংসতাটুকু একজন ছেলে আরেকজন ছেলের ওপর করেনি, একটি মেয়ে আরেকজন মেয়ের ওপর করেছে। কারণ তারা বিশ্বাস করে একটি মেয়ের নিজস্ব চিন্তাভাবনায় বিশেষ মূল্য নেই, তারা সামাজিক রীতিনীতির একটি উপকরণ মাত্র। বেশ কিছুদিন আগে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে একটি দুর্ঘটনায় বেশ কিছু মেয়ে মারা গিয়েছিল। ব্যাপারটি এত রুটিন যে, সেটি আজকাল সেরকম আলোড়ন সৃষ্টি করে না কারণ একবার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল মাত্র আড়াই হাজার টাকা। ঠিক তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব দেশে বেড়াতে এসেছিল, সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছে, খাবার পর বিল এসেছিল আড়াই হাজার টাকা। বন্ধুবান্ধবের সবাই পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল বিল পরিশোধ করার জন্য—কারো জন্যই আড়াই হাজার টাকা কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। আমাদের সমাজও স্বীকার করে নিয়েছে গার্মেন্টস কর্মী একটি মেয়ের মূল্য একটি সম্ভ্রান্ত রেস্টুরেন্টের একবেলা খাবারের মূল্যের বেশি নয়।

এটি অত্যুক্তি নয় যে, আমরা মেয়েদের তার প্রয়োজনীয় সম্মানটুকু দেই না। শিক্ষিত সংস্কৃতবান মানুষদের অন্তত বাহ্যিক পরিবর্তনটুকু ঘটতে শুরু

www.BanglaBook.org

করেছে—কাজকর্মে মহিলা সহকর্মীরা সমানভাবে কাজ করছে দেখে তাদের শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করছে। বইপত্র, ম্যাগাজিন, ছায়াছবি, রেডিও, টেলিভিশন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মাধ্যমে তারা নিজেদের বিকশিত করতে শুরু করেছে। কিন্তু দেশের একেবারে সাধারণ মানুষের সেই সুযোগটি নেই। তাদের নিজেদের নৈতিকতা গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে পারিবারিক মূল্যবোধ এবং ধর্ম। পারিবারিক মূল্যবোধ ব্যাপারটিও তার বড় শক্তি গ্রহণ করে ধর্ম থেকে। এই ধর্মের পুরো নিয়ন্ত্রণটুকু যারা নিয়েছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল নন—ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য আমি বাজার থেকে কিছু ধর্মবিষয়ক বই কিনে এসেছি (যে কোনো সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে এগুলো পাওয়া যায়, এই বইগুলো বহুল প্রচারিত বাংলাদেশ থেকে যেসব বই ভারতবর্ষে রপ্তানি হয় তার বড় অংশ হচ্ছে এই ধর্মীয় রীতিনীতিবিষয়ক বই)। এই বইগুলোতে মেয়েদের সম্পর্কে যে ধরনের ভাষা এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে সেটি পড়লে শুধু মহিলা নয়, যে কোনো বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠবেন। উদাহরণ হিসেবে আমি কিছু অংশ আলাদা করেছিলাম কিন্তু প্রকাশ করতে আমার রুচিতে বাধলো বলে যুক্ত করছি না।

আমাদের দেশে প্রগতিশীল, জ্ঞানী এবং নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অসংখ্য মানুষ রয়েছেন, রেডিও-টেলিভিশনে মাঝেমাঝে তাদের দু-চারটে বক্তব্য শোনা যায়। দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যপাঠ্য যেসব ধর্মের রীতিনীতি সংক্রান্ত বই রয়েছে সেগুলো কিন্তু তাদের লেখা নয়—সেগুলোর বেশির ভাগ লেখা অশিক্ষিত অমার্জিত মানুষের, ধর্মের নামে সেখানে রয়েছে বিচিত্র কুসংস্কার এবং নানা ধরনের অবৈজ্ঞানিক তথ্য। আমার ধারণা প্রগতিশীল মানুষেরা যারা নিজের ধর্মকে ভালোবাসেন এবং মেয়েদের সম্মান করেন তারা যদি আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্মের রীতিনীতি সংক্রান্ত বই লিখতে শুরু না করেন, সাধারণ মানুষের হাতে সেগুলো পৌঁছাতে শুরু না করেন তাহলে মেয়েদের নির্যাতন ভূলমূল থেকে বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে ধর্ম মন্ত্রণালয় বলে একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে—মনে হয় তাদেরকেই সেই দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা মেয়েদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার প্রক্রিয়াটি আমাদের দেশে শুরু হয়ে গেছে। তার প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষা। অবৈতনিক শিক্ষা, বিশেষ বৃত্তি ইত্যাদি দিয়ে গ্রামীন ব্যাংক বা ব্র্যাক-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা যত মহিলাদের সাহায্য করেছে সেই পরিসংখ্যানটুকু হেলাফেলা করার মতো নয়। মহিলারা অর্থোপার্জন করার পর সেই অর্থ পুরুষেরাই ভোগ করছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য একবারে অর্জিত হয়ে যাবে সেটি নিশ্চয়ই কেউ আশা করছে না, উন্নতির ধারাটুকু বজায় রাখতে হবে। ধর্মীয় কুসংস্কার, অপব্যবহার আর ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্যের পরও দেশের নির্বাচনে অসংখ্য মহিলা বের হয়ে এসেছে, তাদের জন্য নির্ধারিত আসনে নির্বাচন করেছে, অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে—এই সবই আসলে আশার কথা। পুরুষেরা সাহায্য করে মহিলাদের উন্নতি করিয়ে দেবে সেটি একেবারেই সত্যি নয়, মহিলারা যখন বুঝবেন এই দেশে তাদের অধিকার ঠিক

একজন পুরুষের সমান, তখন তারাই সেটা আদায় করে নেবেন সে ব্যাপারে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

৬.

তানিয়াকে বা তার মতো অত্যাচারিত কোনো মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমাদের কারো নেই। শুধু তাদের একটি কথা বলা যায় যে, তারা সৌভাগ্যবান যে তারা পাকিস্তানের নাগরিক নয়। পাকিস্তানের নাগরিক হলে ঘটনা প্রমাণ করার জন্য তানিয়াকে চারজন প্রত্যক্ষ পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে হত। এই ধরনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ সাক্ষী-যারা নিজের চোখে দেখেও ঘটনাটি ঘটতে দিয়েছে আসলে দুষ্কর্মের সহযোগী-কাজেই কখনই সাক্ষী পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাই পাকিস্তানে এই ধরনের ঘটনার বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং উল্টোটা ঘটে যাবে, যেহেতু 'দৈহিক সম্পর্ক' ঘটেছে দাবি করা হয়েছে এবং সেটিকে রেপ বলে প্রমাণ করা যায়নি, কাজেই ধরে নিতে হবে মেয়েটি স্বেচ্ছায় এই অবৈধ দেহ সম্পর্ক ঘটিয়েছে। এই অবৈধ 'জেনা' করার জন্য মেয়েটিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ফুটফুটে তানিয়া বাংলাদেশে জন্ম নেওয়ার জন্য বেঁচে গিয়েছে—পাকিস্তানে জন্ম নিলে জেনার অপরাধে তাকে সম্ভবত পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হত। যে ৩০ লাখ শহীদ বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে তাদের কাছে বাংলাদেশের নারীসমাজ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকলে পৃথিবীর নৃশংসতম অপরাধের বিচারের জন্য আজও তারা কারো কাছে যেতে পারত না।

ভোরের কাগজ
২৮শে মার্চ ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

আলতা এবং তানিয়ারা (দুই)

একজন মেয়ে এবং পুরুষের মাঝে পার্থক্যটা কী? জিনেটিকের একটা বইয়ে দেখেছি লেখা রয়েছে, "পুরুষ হওয়ার অংশটুকু কাজ না করা হচ্ছে নারীত্ব" (Femaleness results when the male determining system is not functional)। কেন তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেছে তার বিস্তর কারণ রয়েছে, আমরা সেখানে এখন যাব না। সহজভাবে আমরা বলতে পারি মানুষের শরীরে ২৩ জোড়া (৪৬) ক্রমোজম রয়েছে তার মাঝে এক জোড়া ক্রমোজম ঠিক করে দেয় মানুষটি পুরুষ হবে না মেয়ে হবে। মেয়েদের শরীরের সেই ক্রমোজম দুটির নাম হচ্ছে এক্স এবং এক্স, ছেলেদের বেলায় সেই দুটি হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই (এত কিছু থাকতে কেন এদের নাম দেওয়া হয়েছে এক্স এবং ওয়াই সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই)। মায়ের দেহে একটি ভ্রূণ বিকশিত হওয়ার সময় ওয়াই ক্রমোজম ভ্রূণটিকে পুরুষ হিসেবে গড়ে তুলে। মানুষের জন্মের ব্যাপারটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। তার শরীরের ২৩ জোড়া ক্রমোজমের ২৩টি আসে মা থেকে বাকি ২৩টি আসে বাবা থেকে। মায়ের শরীরে দুটিই এক্স ক্রমোজম বলে ডিম্বাণুতে সব সময় থাকে এক্স ক্রমোজম। বাবার দেহে এক্স এবং ওয়াই ক্রমোজম দুটিই থাকে বলে শুক্রাণুর অর্ধেকগুলোতে থাকে এক্স ক্রমোজম বাকি অর্ধেকে থাকে ওয়াই ওয়াই ক্রমোজম। জন্ম মুহূর্তে যে শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় সেটিতে যদি থাকে এক্স ক্রমোজম তাহলে সন্তানটি হবে মেয়ে, যদি থাকে ওয়াই ক্রমোজম তাহলে সন্তানটি হবে ছেলে। শুক্রাণুতে সমান সমান এক্স এবং ওয়াই ক্রমোজম থাকে বলে ছেলে এবং মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও সমান। এ ব্যাপারে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের "দ্বিতীয় লিঙ্গ" বইটিতে দেওয়া তথ্য "...ভাই মেয়েই বেশি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা, জন্মও নেয় বেশি" (প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৮২) সঠিক নয়। তবে এর পরের বাক্যটি "কিন্তু মেয়ে পৃথিবীতে স্বাগত নয়"—সম্ভবত একটি অপ্রিয় এবং দুঃখজনক সত্যি কথা। এখনো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তুলনামূলকভাবে মেয়ে সন্তান থেকে ছেলে সন্তান অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। আমাদের দেশে মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য কত মায়ের কত বিচিত্র ধরনের লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে তার হিসাব নেই, অথচ মজার কথা হল লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করতে হলে সেটি সহ্য করা উচিত বাবার, পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রয়োজনী ওয়াই ক্রমোজমটি বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

মেয়ে সন্তান এখনো মোটামুটিভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত তার নানারকম কারণ থাকতে পারে। মেয়েকে বড় করে তাকে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত দায়িত্বটি কারো কারো কাছে কঠিন মনে হতে পারে, বিত্তশালী মানুষদের সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যাপারেও পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। অনেক দরিদ্র পরিবার বিশ্বাস করে ছেলে বড় হয়ে তাকে দেখে শুনে রাখবে—মেয়ে সেটা পারবে না। সেটাও একটা কারণ হতে পারে। তবে ঘুরে-ফিরে একটি জিনিস সবাই মেনে নিচ্ছে যদিও ছেলে

এবং মেয়ে দুজনই মানুষ, কিন্তু তাদের দেখা হয় ভিন্ন চোখে। দেখেশুনে মনে হয় সারা পৃথিবীতেই সবাই যেন বিশ্বাস করে বসে আছে পুরুষ প্রজাতিটি উন্নতর, সেই জন্যই মেয়ে সন্তান এখনো অনাকাঙ্ক্ষিত। আজকাল 'এমনিও ওসন্টিসিস' বা আলট্রা সাউন্ডের যুগে যখন বুঝা যায় গর্ভের সন্তানটি কন্যা সন্তান তখন কত শিশু জন্মের আগেই প্রাণ হারিয়েছে তার কী কোনো পরিসংখ্যান আছে?

পুরুষ এবং মহিলার এই সামাজিক অবস্থানটি পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক, মোটামুটিভাবে সকল ধর্মই অবশ্য এই ধরনের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিটি হচ্ছে বিশ্বাস, যুক্তিতর্ক নয়। যুক্তিতর্ক দিয়ে পুরুষ এবং মহিলার মাঝে কে উন্নত আর কে অনুন্নত সেটা প্রমাণ করা যায় না। ইদানীং অবশ্য একটা নতুন ফ্যাশন শুরু হয়েছে সেখানে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে বলা হচ্ছে ছেলেরা হচ্ছে ছেলেদের মতো এবং মেয়েরা হচ্ছে মেয়েদের মতো। বলা হচ্ছে এই পার্থক্যটা শুধু শারীরিক নয় মানসিকও বটে। তাদের বইপত্রে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছেলেদের এবং মেয়েদের বলে আলাদা করা হয়েছে। সে রকম একটা বই আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ে দেখেছি কিন্তু তথ্যগুলো এমন কিছু বৈজ্ঞানিক মনে হয়নি। যেমন এই বইয়ে দাবি করা হয়েছে :

(ক) পুরুষেরা বেশি স্বাধীনচেতা (খ) মেয়েরা সহজে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে (গ) মেয়েরা দুশ্চিন্তা করে (ঘ) পুরুষেরা নিজের রাগ প্রকাশ করে ফেলে, মেয়েরা চেপে রাখে (ঙ) পুরুষেরা প্রতিযোগী মেয়েরা সহযোগী (চ) পুরুষদের জন্য আত্মসম্মান খুব গুরুত্বপূর্ণ (ছ) পুরুষেরা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণকারী (জ) সমস্যায় পুরুষেরা দেয় উপদেশ মেয়েরা জানায় সমবেদনা (ঝ) পুরুষদের রসবোধ বেশি (ঞ) পুরুষেরা আত্মগর্বিত (ট) মেয়েরা বেশি ঘ্যানঘ্যান করে (ইংরেজি বাক্যটি ছিল Nags more often!) (ঠ) ছেলেরা স্যাডিস্ট ধরনের এবং মেয়েরা ম্যাসোকিস্টিক ধরনের (ইংরেজি শব্দ দুটো ইংরেজিই থাকুক!)

কেউ যদি ধৈর্য ধরে এই লিস্টটি পড়ে এসে থাকেন আমি নিশ্চিত পুরো গবেষণার মাঝে কেমন জানি পুরুষ পুরুষ গন্ধ খুঁজে পাবেন। (বইয়ে আরো নানা ধরনের আদি রসাত্মক ভাগাভাগি আছে, বাচ্চাদের লেখক হিসেবে খানিকটা পরিচিত আছে বলে আমার এই কলামটি বাচ্চা-কাচ্চারাও পড়ে ফেলছে খবর পেয়ে আমি আর বেশি এগোতে সাহস পাচ্ছি না!) তবে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঢঙে লেখাগুলো মৌলবাদীদের ফতোয়া থেকেও বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষেরা-যারা বিজ্ঞানকে এখনো সম্মান করেন তারা এটাকে সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভেবে তথ্যগুলো বিশ্বাস করে বসে থাকতে পারেন। বিজ্ঞানের নামে এই পৃথিবীতে যত দুই নম্বরি কাজ হয়েছে সে রকম আর কোথাও হয়নি!

সত্যি সত্যি যদি একেবারে নিরঙ্কুশভাবে পুরুষ এবং নারীকে যাচাই করা হয় এবং প্রশ্ন করা হয় দুজনের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ তাহলে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ ব্যাপারে নারীদের পুরুষের ওপরে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিককালে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্লোন করা শুরু হয়েছে, মানুষের ক্লোন করা বিজ্ঞানের ধরা-ছোঁয়ার মাঝে চলে এসেছে। বছর দশেক আগে মানুষকে ক্লোন

www.BanglaBook.org

করা হয়েছে বলে নিউজউইকে একটা বিশাল প্রতিবেদন বের হয়েছিল। তখন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে রাজি হননি। এখন আর কেউ অবিশ্বাস করবে না। আমি মোটামুটি নিশ্চিত ইতোমধ্যেই গোপনে মানুষের ক্লোন করা শুরু হয়ে গেছে। মানুষকে ক্লোন করে জন্ম দেওয়ার পদ্ধতিটি আবিষ্কার হওয়ার পর পুরুষের কোনো সাহায্য না নিয়েই মেয়েরা মানব শিশুর জন্ম দিতে পারবে, সৃষ্টি জগতে মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। প্রাণীজগতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা, এই কাজটি যদি মেয়েরা নিজেরাই করতে পারে এবং পুরুষ সেখানে একটি বাহুল্যমাত্র তাহলে এক অর্থে এটি অতিশোয়াক্তি নয় যে নারী পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি—পুরুষ নয়।

৮.

যদিও ভবিষ্যতে কখনো শুধুমাত্র মেয়েরাই মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে বলে অনুমান করা যায় কিন্তু সেটি কারো কাম্য হতে পারে না। নারী-পুরুষের ভালবাসায় শিশুর জন্ম হওয়া এবং পরিবারের স্নেহের বাঁধনে সেই শিশুর বড় হওয়ার যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আমরা দীর্ঘদিন সেটি দেখবো বলে আশা করি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনো পরিশীলিত হয়নি, এই সমাজে মেয়ে এবং পুরুষের মাঝে এক ধরনের বৈষম্য রয়েছে। শুধু যে আমাদের দেশে রয়েছে তাই নয় বাইরের পৃথিবীতেও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বড় বড় বিল্ডিং গড়ে তোলার সময় সেখানে অনেক নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাদের দৈনিক মজুরি একজন পুরুষ শ্রমিক থেকে অনেক কম। গার্মেন্টস শিল্পে মেয়েদের শ্রমকে কি অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতায় ব্যবহার করা হয় খবরের কাগজে চোখ বুলালেই সেটি দেখা যায়। আমার স্ত্রী মেয়েদের হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি বৈষম্যের আরো বিচিত্র দিক আবিষ্কার করেছি। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা সিলেট থেকে ঢাকা আসার সময় ছাত্রদের বেশি অর্থ দেওয়া হয়, বার্ষিক ভোজেও ছাত্রদের জন্য আলাদা পক্ষপাতিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা সচেতন বলে বৈষম্যটুকু দেখিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অপসারণ করা হয়েছে কিন্তু যেটা লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে, এটি যে একটি বৈষম্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার আগে কারো চোখে পড়েনি, মেয়েদের সব সময় কম দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা যায় আমাদের সমাজ সেটি মেনে নিয়েছে।

দৈনিক মজুরি, সুযোগ-সুবিধে কিংবা বেতনের বৈষম্য থেকেও বড় বৈষম্য হচ্ছে সামাজিক দায়িত্বের ভাগাভাগিতে। কোনো মেয়ে যদি কোনোভাবে কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে মেয়েদেরই তার দায়ভারটি নিতে হয়। কোনো উচ্ছৃঙ্খল তরুণ যদি একটি মেয়েকে অপমান করে বসে তাহলে তরুণটিকে শাসন করার আগে সবাই মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধরে নেওয়া হয় পুরো ব্যাপারটিতে মেয়েটির নিশ্চয়ই কোনো দোষ রয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরো ব্যাপারটি গোপন করে ফেলার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়। অপরাধী বড় ধরনের অপরাধ করে আবিষ্কার করে ব্যাপারটি কেউই জানছে না বরং যে মেয়েটির ওপর অপরাধ করা হয়েছে সে আরো গুটিয়ে গেছে। তখন তারা পুরো ব্যাপারটিতে বিমলানন্দ পেতে শুরু করে। আমি

স্বীকার করি বড় ধরনের সম্ভ্রমহানির ঘটনায় গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন আছে কিন্তু অত্যন্ত তুচ্ছ রুচিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার ঘটনা আড়াল করে রেখে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। এই ধরনের ঘটনায় মেয়েদের কোনো দোষ নেই, তারা মুখ ফুটে নালিশ না করা পর্যন্ত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যায় না এটি বুঝতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে সমাজকে ঠিক করা যায় না এ কথা সত্যি কিন্তু অপরাধীকে উৎসাহ দিলে কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি সেই ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষ থেকে ভালো করে কে জানে?

৯.

এই মুহূর্তে আমরা চোখ খুলে তাকালে চারপাশেই মোটামুটি একই দৃশ্য দেখতে পাই, পুরুষেরা প্রত্যক্ষভাবে (কিংবা পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থা পরোক্ষভাবে) মেয়েদের ওপরে এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করছে এবং মেয়েরা সেটা সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। ঠিক কীভাবে এটা শুরু হয়েছে সেটি নিশ্চয়ই সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং আলোচনার বিষয় তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এর মাঝে শারীরিক গঠনের কোনো ভূমিকা নেই। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েদের শারীরিকভাবে ছেলেদের থেকে খানিকটা দুর্বল বলে মনে হলেও সেটি একান্তই আপেক্ষিক। সমাজিক, ধর্মীয় এবং নানা কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা ছোটাছুটি বা দৌড়াদৌড়ি করে না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তরুণ এবং তরুণীরা উভয়েই সমানভাবে খেলাধুলা করে, দৌড়াদৌড়ি করে, সাঁতার কাটে, কোচিং করে, কিংবা করে এবং যারা আর কিছুই করে না তারাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচানাচি করতে পারে। আমি লিখে দিতে পারি আমাদের দেশের একজন গড়পড়তা তরুণ থেকে পাশ্চাত্য দেশের একটি মেয়ে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী! কাজেই মেয়েদের গায়ের জোর 'কম' বলে তাদের ওপর বৈষম্যটুকু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি সেটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না, মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, কাজেই তাদের সকল কাজকর্মই যে চিন্তাভাবনা প্রসূত হবে সেটাই স্বাভাবিক।

আমি শুনেছি পৃথিবীর কোনো এক দুর্গম জায়গায়, কোনো এক উপজাতির সমাজব্যবস্থায় পুরুষ এবং মেয়ের ভূমিকা ঠিক উল্টো। সেখানে পুরুষেরা বাড়িতে থেকে ঘর সংসারের কাজ করে। মেয়েরা সারা দিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে শিকার করে এবং সন্ধ্যাবেলা তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীর কাছে ফিরে আসে। পুরুষেরা তখন সেজেগুজে তাদের 'মনোরঞ্জনের' চেষ্টা করে। সেই সমাজে পুরুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে দুর্বল এবং অথর্ব হয়ে পড়ে তখন সে পুরোপুরি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বিচিত্র এই উপজাতি সম্পর্কে নিবন্ধটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে প্রকাশিত হয়েছিল বলে শুনেছি—আমি লেখাটি খুঁজছি। এখনো নিজের চোখে দেখিনি বলে জোর করে কিছু বলতে পারছি না। তবে ব্যাপারটি একেবারেই অবাস্তব কিছু নয়, আমরা ধীরে ধীরে মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি যেসব কাজ পুরুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না বলে ধারণা ছিল সেখানেও মেয়েরা স্থান করে নিচ্ছে। একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে মিসেস জাহানারা ইমামের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে শুরু করে মেয়েদের কলেজে অস্ত্র হাতে ছাত্রী সন্ত্রাসী পর্যন্ত রয়েছে। দেশের

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে দায়িত্বশীল পদ—প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে শুরু করে বাণিজ্য মেলায় পকেটমার পর্যন্ত সর্বত্র মহিলাদের আবিষ্কার করেছি। মাটিকাটা এমনকি রিকশা চালানো পর্যন্ত কঠিন শারীরিক কাজগুলো মেয়েরা সম্ভব হলে প্রকাশ্যে সম্ভব না হলে গোপনে করে যাচ্ছে। কাজেই মেয়েদের ওপরে চাপিয়ে রাখা বৈষম্যটুকু যে কৃত্রিম এবং ক্ষয়িষ্ণু এবং সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছে, সামাজিক কুসংস্কার বা ধর্মের অনুশাসন দিয়ে তাদের আটকে রাখা কঠিন, আমি নিশ্চিত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরা এই বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

১০.

আমি দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখি করে আসছি, এসব লেখা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি সেগুলো এসেছে ছোট ছোট মেয়েদের কাছ থেকে। তারা অনেকে সখেদে জানতে চেয়েছে আমার গল্প—উপন্যাসে অ্যাডভেঞ্চারের চরিত্রগুলো সব সময় ছেলে কেন? আমার চরিত্রগুলোতে কোনো মেয়ে নেই কেন?

আসলে এটি শুধু প্রশ্ন নয়, এটি এক ধরনের অভিযোগও বটে এবং আমি যতবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি ততবার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের বলেছি যে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একটা ছোট ছেলে হিসেবে বড় হয়েছি, একটি ছোট ছেলের বা কিশোরের জীবনের হাসি, কান্না, জটিলতা, সমস্যা, রাগ-ক্রোধ-দুঃখ-ঘেন্না-হাসা-কৌতুক বা অ্যাডভেঞ্চারের কথা আমি জানি তাই সেটা নিয়েই লিখেছি। কিন্তু একটা মেয়ের জীবনের সেই অংশটুকু তো আমি জানি না, আমি সেটা নিয়ে কেমন করে লিখব? (ইদানীং তবুও আমি চেষ্টা করছি, অভিযোগটি গুরুতর)।

যদিও ব্যাপারটি উঠে এসেছে অল্পবয়সী এবং খানিকটা অভিমানী পাঠিকাদের ছেলেমানুষী প্রশ্ন থেকে কিন্তু আমার ধারণা ব্যাপারটি মোটেও ছেলেমানুষী নয়। নারী-পুরুষ বৈষম্যের একেবারে গোড়ার প্রশ্নটি এর মাঝে লুকিয়ে আছে। আমরা পুরুষেরা, মেয়েদের জীবনের অনেক কিছুই জানি না। একবার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণের একটি অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে আটকা পড়েছি বিশাল কিছু নয়—মাঝে মাঝে ছোট ছোট জিনিসের জন্য মন আকুলি বিকুলি করত। হঠাৎ হঠাৎ এক ধরনের অদম্য ইচ্ছে করত সন্ধ্যাবেলা নিশ্চিন্ত স্বাধীনভাবে স্টেডিয়ামের বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়াতে। আমার এই কথার সূত্র ধরে আমার পরিচিতা একজন নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'একাত্তরে আপনার যেই জিনিসটি করতে ইচ্ছে করত, আমাদের মেয়েদের, এখনো সেই জিনিসটি করতে ইচ্ছে করে, আমরা এখনো এ দেশের কোথাও স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারি না।'

তার কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরে এক ধরনের অপরাধবোধের বেদনা অনুভব করেছিলাম। এ দেশের পথে-ঘাটে-দোকান-পাটে, স্কুল-কলেজে, বইমেলায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা মেয়ে তার মনের গহীনে যে চাপা ভয় লালন করে আমি তার কথা জানতাম না, যখন জেনেছি তখনো সেটা সত্যিকার অর্থে অনুভব করতে পারিনি। পুরুষ শাসিত নিয়ম-নীতিহীন এক ধরনের

উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে থাকতে গিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের এ রকম আরো কত ভয়, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, হতাশা, ক্ষোভ এবং লজ্জাকে বুকের গভীরে লালন করতে হয় কে জানে। আমরা পুরুষেরা কখনো কী সেই অনুভূতিগুলো বুঝতে পারব?

মেয়ে এবং ছেলেদের জীবনধারার মাঝে এই যে বৈষম্য সেটি দূর করার জন্য আমাদের দেশে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা হয়েছে। খবরের কাগজে, রেডিও-টেলিভিশনে মাঝে মাঝে নারী অধিকার সম্পর্কিত সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের খবর পাই, তবে সব সময়েই এর একটি ব্যাপার আমাকে পীড়া দিয়েছে। এই সংগঠনগুলো মূলত নারী সংগঠন, মনে হয় সমস্যাটি মেয়েদের এবং শুধুমাত্র মেয়েদেরই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এ ব্যাপারে যেন ছেলে কিংবা পুরুষদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না। পৃথিবীর সকল বঞ্চনা বা বৈষম্যের রূপ এক, এই বৈষম্য যদি দূর করা যায় শুধু যে নারীদের অধিকার আদায় হবে তাই নয় শিশুদের অধিকার এমনকি বঞ্চিত দুর্বল পুরুষদের অধিকারও আদায় হবে।

নারী অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রমে পুরুষদের অনুপস্থিতির কারণটি সম্ভবত একটি ভুল বোঝাবুঝি। 'নারী অধিকার' কথাটির পাশাপাশি আমরা আজকাল, 'নারীবাদী' বলেও একটা কথা শুনে থাকি। নারী অধিকার কথাটি বুঝা খুব সহজ, তার মানবিক অংশটুকু এত স্পষ্ট যে, সবাই তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারে। সেই তুলনায় 'নারীবাদ' কথাটি বেশ কঠিন, এর প্রকৃত অর্থ কী বুঝা সহজ নয়। নারীবাদী লেখকদের লেখা পড়লে মাঝে মাঝেই ব্যথিত হতে হয়। আমার ভুল হতে পারে কিন্তু মনে হয় সেখানে পুরুষদের একটি 'দোষী' কিংবা 'অপরাধী গোষ্ঠী' হিসেবে চিত্রিত করা হয়। কয়দিন আগে ভানিয়ার ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর ভোরের কাগজেই একটি নিবন্ধে সকল পুরুষ মানুষের ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। অপরাধীদের সঙ্গে সকল পুরুষদের এ রকম সরলীকরণ ঠিক নয়।

পুরুষমাত্রই অসৎ এবং দুশ্চরিত্র সেটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সেটি কখনো প্রমাণিত হবে না। পুরুষ কিংবা মেয়ে দুজনেই প্রথমে মানুষ এবং মানুষের ভিতরে এই মনুষ্যত্ব তার সকল অনুভূতির ওপর স্থান করে রেখেছে। খবরের কাগজের নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো পড়ে আমাদের যুক্তিতর্ক অন্ধ হয়ে আসতে চায় কিন্তু তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীতে এখনো ভালবাসা স্নেহ মমতা বেঁচে আছে এবং সেটাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে এক ধরনের কঠিন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষদের দোষী সাব্যস্ত করে লেখালেখি করা হয়। এই ধরনের লেখার একটি দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটি মেয়ে পুরুষদের প্রতি বিরূপ একটি মনোভাব নিয়ে বড় হতে পারে, সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি তার একটি অবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে নারী এবং পুরুষের মাঝে ভালবাসা—যদি সেই ভালবাসাটি গড়ে ওঠার আগেই আমরা অবিশ্বাসের বিষ দিয়ে সেটিকে ক্লেদাক্ত করে দেই তাহলে কি আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি একটা বড় ধরনের অন্যায় করব না?

ভোরের কাগজ
১৬ই এপ্রিল ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

শুভ জন্মদিন

১.

সব মানুষের জীবনেই মনে হয় কিছু না কিছু নিয়ে খানিকটা আফসোস থেকে যায়। আমারও আছে। চিত্রশিল্পী সুলতানের রহস্যময় জীবনকাহিনী পড়ে তাকে সামনাসামনি দেখার বড় শখ ছিল, দেশে ফিরে আসতে আসতে তিনি চলে গেলেন বলে দেখা হল না। কবি নজরুলকে সামনাসামনি দেখতে না পারার পুরো দোষটি আমার নিজের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে, দেখতে যাব দেখতে যাব করতে করতেই হঠাৎ দেখি তিনি মারা গেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়েও আমার একই দুঃখ। খবর পেয়েছি অপারেশন শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন, বিপদ কেটে গেছে, সিলেট থেকে ঢাকা গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধটুকু জানিয়ে আসব- হঠাৎ দেখি তিনিও মারা গেছেন।

মিসেস জাহানারা ইমামকে নিয়ে আমার সে রকম কোনো আফসোস থাকার কথা ছিল না। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও তিনি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে নবজন্মটি উপহার দিয়ে গেছেন সে জন্য পুরো জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মিসেস জাহানারা ইমাম যখন বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করে গোলাম আযমের মতো নরঘাতকদের বিচার করছেন, দেশদ্রোহীদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে—তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্র যেতে হত, সে কারণে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, পরিচয় হয়েছিল এবং আমি তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। দেশের জন্য তিনি যেটুকু করেছেন তার জন্য আমি অনেকবার আমার কৃতজ্ঞতাটুকু তাঁকে জানাতে চেয়েছি, তিনি কখনো সে সুযোগ দেননি। তিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, মন্ত্রী ছিলেন না, স্তুতিবাক্য শুনে তাঁর অভ্যাস নেই। অন্যদের বেলায় কী করেছেন জানি না, আমি যতবার চেষ্টা করেছি আমাকে বকে দিয়েছেন (বকাবকির জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করতেন, আমাকে বলেছিলেন "এটা আত্মতুষ্টির সময় না-আমাদের অনেক কাজ বাকি" ইত্যাদি!)। তিনি যখন শেষবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন তখন আমি তাঁকে একটা উপহারের প্যাকেট পাঠিয়েছিলাম, অত্যন্ত ক্ষুদ্র উপহার : লেখালেখি করার জন্য একটা নোটবই আর কলম, যখন লেখালেখি করার ইচ্ছে করবে না তখন পড়ার জন্য টনি মরিসনের একটা বই। যখন বই পড়ারও ইচ্ছে করবে না তখন শোনার জন্য সাদী মুহম্মদের একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট। এই তুচ্ছ উপহার পেয়ে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে তিনি আমাকে অপূর্ব একটি চিঠি লিখেছিলেন, তার এক জায়গায় ছিল ঃ'..... সাদীর গান এক পিঠ শোনা হল। অন্য

পিঠের একটি গানের প্রথম লাইনটি এই মাত্র কানে ঠেকল- 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো'। পুরো গানটায় এখন মনোযোগ দিতে পারছি না, তবে এখন লাইনটাই মনে দাগ কেটে দিল- আমার পথে পথে বাধার পাথর ছড়ানো।....'

বিশাল পৈশাচিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের সাফল্যের পিছনে অনেক গোপন দীর্ঘশ্বাস রয়েছে, তিনি কথায় কথায় মাঝে মাঝে তার উল্লেখ করতেন। আমাকে বলেছিলেন তাঁর অসংখ্য তথ্য তিনি তুলে রেখেছেন, আন্দোলন শেষে লিপিবদ্ধ করে যাবেন। জীবনের বাতি যখন নিভে আসছে তখনও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার মতো মানুষ পৃথিবীতে কয়জন আছে?

মিসেস জাহানারা ইমামকে নিয়ে আমার আফসোস থাকার কোনো কারণ ছিল না, তিনি কখনো কারো স্তুতিবাক্য শুনতে চাইতেন না, কিন্তু মানুষের ভালবাসা তো বাক্য দিয়ে বলতে হয় না, বাংলাদেশের নবপ্রজন্মের ভালবাসার কথা তো তিনি জানতেন। কিন্তু তবুও তাঁকে নিয়ে আমার ছোট একটা আফসোস রয়ে গেছে।

মিসেস জাহানারা ইমামের অসংখ্য পরিচয় : তিনি মা এবং গৃহবধূ, তিনি শিক্ষক এবং লেখিকা, তিনি সংস্কৃতিকর্মী এবং সমাজসেবিকা, তিনি নেতা এবং সংগঠক, তিনি সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু, তিনি ধৈর্যশীল এবং সুবক্তা- কিন্তু সবকিছুর ওপরে তিনি একেবারে সাদাসিধে ছেলেমানুষ। নিউইয়র্কে সুদীর্ঘ নিষ্ঠুর নির্মম সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর সঙ্গে আমি গাড়ি করে দীর্ঘপথ গিয়েছি, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেছি এবং সবসময় তাঁর একেবারে সহজ-সরল ছেলেমানুষ রূপটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কাজের বাইরে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিষয়বস্তু ছিল ছেলেমানুষি- ডিজনীর ছবি, শিশুদের অর্থহীন কাজকর্ম, বাচ্চাদের দুষ্টুমি। মিসেস জাহানারা ইমামের সব রূপই আমি দেখেছি কিন্তু এখন যখন তাঁর কথা মনে পড়ে, আমার সেই ছেলেমানুষি রূপটার কথাই মনে পড়ে, হাসি হাসি মুখে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে আমার সঙ্গে আলোচনা করছেন ডিজনীর বাচ্চাদের এনিমেশান ছবিগুলোর কোনটি কী রকম! ঠিক তখন আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি- কারণ তিনি মারা যাওয়ার পর আমি জানতে পেরেছি আমার শৈশবের সবচেয়ে পছন্দের বইগুলো তিনি মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। লরা ইংগলস ওয়াইল্ডারের সেই মনোমুগ্ধকর প্রেইরী জীবনকাহিনীর বইগুলো- যেগুলো পড়ে এখনো আমি বুকে শৈশবের আনন্দের ছোঁয়া অনুভব করি সেই কথাগুলো আমি তাঁকে বলতে পারিনি। তিনি কোনো স্তুতিবাক্য শুনতে চাইতেন না কিন্তু আমি জানি শৈশবের সেই মনোমুগ্ধকর বইগুলোর কথা তাঁকে বললে তাঁর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত- আমি জানি আমাকে তিনি বকতেন না- বইগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন, বইয়ের চরিত্রগুলো- লরা মেরী ক্যার আর গ্রেইসদের নিয়ে কথা বলতেন। বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠিতরা কেউ কিছু লিখেন না-মিসেস জাহানারা ইমাম অনবদ্য কিছু অনুবাদ করে গেছেন- আমি বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতাম-কিন্তু সেটি করা হল না। সেটি আর করা হবে না।

www.BanglaBook.org

২.

আমি সারা জীবনে একবার মাত্র একটি সাংবাদিক সম্মেলন দেখেছি। সেটি হয়েছিল ১৯৯২ সালে নিউইয়র্কে। মিসেস জাহানারা ইমাম সেই সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে আমি আবিষ্কার করেছিলাম সাংবাদিকরা পুরোপুরি নিরপেক্ষ নন, তারা যেটা বিশ্বাস করেন সেটা ছলে বলে কৌশলে অন্যের মুখ থেকে বের করে নিয়ে আসতে চান। (পরে দেখেছি সেটা বের করতে না পারলেও তারা নিরুৎসাহিত হন না- প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বানোয়াট জিনিস লিখে দেন!) সেই সাংবাদিক সম্মেলনে আমি প্রথমবার 'টুথপেস্টের মতো ধৈর্য' কথাটির প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করেছিলাম। টুথপেস্ট যেরকম পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলেও টিপে টিপে খানিকটা বের করে ফেলা যায়, মিসেস জাহানারা ইমামের ধৈর্যের বেলাতেও তাই। নিষ্ঠুর ধরনের সাংবাদিকরা যখন আজেবাজে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন করে করে তাঁকে ধৈর্যের শেষ সীমাতে নিয়ে যায় এবং মনে হতে থাকে এই বুঝি তিনি রাগে ফেটে পড়বেন কিন্তু দেখা যায় তিনি রাগেন না, শান্ত গলায় কথা বলেন।

একবার শুধু একবার তাঁকে আমি প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠতে দেখেছিলাম। একজন সাংবাদিক বলতে শুরু করেছে, 'সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন রাজাকার হয়ে গেছে-'।

মিসেস জাহানারা ইমাম তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'কক্ষনো না। কক্ষনো সারা বাংলাদেশের মানুষ রাজাকার হয়ে যায়নি, কক্ষনো বাংলাদেশের মানুষ রাজাকার হয়ে যাবে না।'

বাংলাদেশের মানুষ অসংখ্যবার প্রমাণ করেছে, মিসেস জাহানারা ইমামের কথা সত্যি। যতদিন বাংলাদেশের পতাকা আকাশে উড়বে ততদিন রাজাকারদের জন্য এই দেশে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু থাকবে না। রগকাটা ক্যাডার থেকে শুরু করে দেশের প্রেসিডেন্ট- রাজাকারের ছাপ থাকলে এই ঘৃণা থেকে কারো মুক্তি নেই।

৩.

বিরানব্বই কিংবা তিরানব্বই সালে একবার মিসেস জাহানারা ইমাম নিউ জার্সি এসেছেন। খবর পেয়ে আমি দেখা করতে গিয়েছি, আমাকে দেখে উজ্জ্বল চোখে হেসে বলেন, 'আমার বেশি কাছে এসো না।'

'কেন খালাম্মা? কী হবে কাছে এলে?'

'আগে তো শুধু দেশদ্রোহী ছিলাম- এখন হয়েছি খুনের আসামি!'

'খুনের আসামি?'

'হ্যাঁ। জামায়াতে ইসলামীর কে জানি খুন হয়েছে, আমাকে আসামি করে মামলা দিয়েছে!' তিনি রহস্যভরে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু খুনের আসামি, আমার থেকে সাবধান!'

আমি অবাক হয়ে 'দেশদ্রোহী' এই 'খুনের আসামি'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই দেশে কিংবা এই পৃথিবীতেও কি কোথাও এর থেকে বড় উৎকট রসিকতার কথা কেউ বলতে পারবে? খুনের মামলাটির শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল আমি জানি না, তৎকালীন বিএনপি সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশদ্রোহী হিসেবেই বিবেচনা করেছিল। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার এই উৎকট রসিকতার অবসান ঘটিয়ে দেশদ্রোহিতার মামলা তুলে নিয়ে পুরো দেশকে হাস্যাস্পদ হয়ে থাকার লজ্জা থেকে রক্ষা করেছিল।

৪.

১৯৯৪ সালের মে মাসের দিকে আমরা মোটামুটিভাবে জেনে গেলাম মিসেস জাহানারা ইমামের সময় শেষ হয়ে এসেছে। ক্যান্সার তাঁর মুখের মাঝে, গলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তারেরা অপারেশন করতে গিয়ে থমকে গিয়ে অপারেশন না করেই অপারেশন থিয়েটার থেকে ফিরে এসেছেন। গলায় স্ট্রেকোমি করা হয়েছে, তিনি আর কথাও বলতে পারেন না। সবাই জেনে গেছে তিনি আর বাঁচবেন না।

আমি তখন থাকি নিউ জার্সিতে, তিনি থাকেন তাঁর ছেলের বাসার কাছাকাছি মিশিগানের এক হাসপাতালে। নিউজার্সি নিউইয়র্কের আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব, আমরা কেউ মুখে উচ্চারণ করিনি কিন্তু সবাই জানি এই হবে আমাদের শেষ দেখা।

কয়েকজন বিজ্ঞানী, একজন হোটেল মালিক, কয়েকজন ছাত্র, একজন প্রায় কিশোর ট্যাক্সি ড্রাইভার- এরকম একটি বিচিত্র দল নিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি আমরা নিউজার্সি থেকে রওনা দিয়েছি। সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ভোরে পৌঁছেছি মিশিগানে। হাসপাতালে গিয়েছি অপরাহ্নে। মিসেস জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্যের কারণে খুব কড়াকড়ি- ডাক্তাররা একসঙ্গে দুজনের বেশি দেখা করতে দিচ্ছে না। প্রথমে দুজনে দেখা করতে গেলে আমি অন্যদের সঙ্গে ভিজিটর্স লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করতে করতে আমি কেমন জানি বিপন্ন অনুভব করতে থাকি। আমি যখন থেকে তাঁকে চিনি তখন থেকে তিনি ক্যান্সারের থাবায় ক্ষতবিক্ষত-কিন্তু তবুও তিনি প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন। এই প্রথমবার আমি তাঁকে দেখব তিনি ভয়াবহ ব্যাধির আক্রমণে পরাজিত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁকে এই রূপে কখনো দেখিনি- কেমন করে সেটি এখন দেখব?

যখন আমার সময় হল আমি নিজেকে প্রায় টেনে টেনে হাসপাতালের লিফট ধরে উপরে উঠে তাঁর কেবিনে উপস্থিত হলাম। ধবধবে সাদা বিছানায় তিনি বসে আছেন, আমাকে দেখে তিনি হাসলেন, যেন ভারি মজার কিছু হয়েছে আমাকে সেটা বলবেন। আমি জানি তিনি আর কোনোদিন কথা বলবেন না। আমি তাঁর আরো কাছে এগিয়ে গেলাম, তিনি আমার দিকে তাঁর হাতটা এগিয়ে দিলেন, আমি তাঁর হাত ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব লাভ হল না। এই ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না ব্যাপারটি চিন্তা করে হঠাৎ আমার বুক ভেঙে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

হাসি হাসি মুখেই একটুকরো কাগজে লিখলেন, 'এখন দুঃখ করার সময় নয়, এখন হাসার সময়।'

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সত্যিই তিনি হাসছিলেন। কাগজে লিখে তিনি আমাকে আরো দু একটি সান্ত্বনার কথা বললেন, আমি আরো কয়েকবার তাঁকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে আবিষ্কার করলাম, মানুষের মুখের ভাষা বড় অকিঞ্চিৎকর। অনেক কথা আছে যেটি এই সীমাবদ্ধ ভাষায় বলা যায় না, বলার চেষ্টা করলে সেটিকে অর্থহীন কৃত্রিম শোনায়। আমি ঝাপসা চোখে তাঁর দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ মনে হল আমি সব সময় তাঁকে যা বলতে চেয়েছি তিনি তা জানেন– আমাকে আর সেটা মুখফুটে বলতে হবে না। আমি আর কিছু বলিনি।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চার বছর কেটে গেছে। বছর সাতেক আগে বিজয়ের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একটা সঙ্কলন বের করেছিলাম। সেই সঙ্কলনে দেশের এবং প্রবাসী অনেক কবি-সাহিত্যিক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের লেখা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমরা মিসেস জাহানারা ইমামের কাছে একটা লেখা চেয়েছিলাম। তাঁর লেখাটির প্রথম অংশ ছিল এরকম :

'...কি লিখবো আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা ? বিশ বছর পরে একটি কথাই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে– বিশ বছরের বিষবাষ্পে সারা দেশ এবং জাতি আজ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছে।'

'আমার কথায় কি খুব বেশি হতাশা প্রকাশ পেল ? সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর বাংলাদেশে যখন প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তখন বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনয়নপ্রাপ্ত জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার ছিলেন বিধায়, জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী বলে, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে সকল বিরোধী দল দাঁড় করিয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের ব্যক্তি বলে ঘোষিত সেই বদরুল হায়দার চৌধুরী কি করলেন ? তিনি একাত্তরের ঘাতক, নয় মাসব্যাপী বাঙালি নিধন ও বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়নকারী গোলাম আযমের বাস ভবনে গেলেন দোয়া চাইতে। একটা জাতির জন্য এর চাইতে আত্ম-অবমাননাকারী ঘটনা আর কি হতে পারে ?....এই ঘটনার পর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের শক্তি বলে কথিত সুবৃহৎ রাজনৈতিক (এবং বিরোধী) দল আওয়ামী লীগ যদি বদরুল হায়দার চৌধুরীর ওপর থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে ঘোষণা দিতেন, তাহলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুখ রক্ষা হত। আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের অন্যান্য বিরোধী দলও তা করলেন না। বরং আরো কি করলেন ? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যেহেতু দলাদলি ভোটাভুটি হয়েছে, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের সময়ে তাই সকল দল 'একমত' হয়ে 'সর্বসম্মতিক্রমে' যাকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করলেন, তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছয় বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন। এরপরও কি নিজের মুখে নিজেই আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরতে ইচ্ছে হয় না?'

মিসেস জাহানারা ইমাম কিন্তু নিজের মুখে নিজে আগুন দেননি, তিনি দেশের নতুন প্রজন্মকে একতাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নবজন্ম দিয়ে দেশদ্রোহীর

মুখে আগুন দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কথাটি রাজনৈতিক দলের কাছে একটা শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়। যদি এই শ্লোগানের কার্যকারিতা কমে যায়, তারা এই শ্লোগান অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দেবে। তাই তিনি তাঁর বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই দেশের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীক্ষিত করে গিয়েছিলেন।

মিসেস জাহানারা ইমামের কাছে তাই এই দেশ ঋণী। এই দেশের মানুষ ঋণী। দেশের আকাশ-বাতাস, মাটি ঋণী। বেঁচে থাকলে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে আমি সম্ভবত সেটা বলার চেষ্টা করতাম। আমি নিশ্চিত তিনি আমাকে বলতে দিতেন না– চমৎকার কিছু শব্দ চয়ন করে আমাকে বকে দিতেন। আমি তবুও চেষ্টা করে দেখতাম।

* * *

ভোরের কাগজে প্রকাশিত 'আলতা এবং তানিয়ারা' পড়ে আমার কাছে যে কিশোরী, তরুণী এবং মহিলারা চিঠি লিখেছেন তাদের প্রায় সবাই তাদের জীবনে কখনো না কখনো পরিচিত পুরুষ মানুষের হাতে অসহায়ভাবে সম্ভ্রম হারিয়েছেন। তারা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমার মতো একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে এই ধরনের একটি জটিল এবং বেদনাদায়ক সমস্যার গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, যদি চেষ্টা করি সেটি আবেগতাড়িত কিছু বৌদ্ধিক বাক্যের বেশি কিছু হতে পারে না। 'আলতা এবং তানিয়ারা' লিখে আমি যাদের জীবনের সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে নতুন করে কষ্ট দিয়েছি, তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রার্থনা করি, প্রিয়জনের ভালবাসায় তাদের জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে যাক।

ভোরের কাগজ
৩০শে মে ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

ছাত্র রাজনীতির 'যদি' এবং 'কিন্তু'

যে কথাটি শোনার জন্য পুরো দেশ অপেক্ষা করছিল শেষ পর্যন্ত সেই কথাটি উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বলেছেন, রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব অনুসারে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে তার সরকার প্রস্তুত। সঙ্গে অবশ্যি একটি 'যদি' রয়েছে— যদি সব দল রাজি হয়। মনে হতে পারে এটি অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন 'যদি', কিন্তু কেউ যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে তাহলেই বুঝবে এটি আসলে তত কঠিন নয়। প্রধানমন্ত্রীর উক্তিটি কোনো চাপের কারণে আসেনি– বাংলাদেশে কার ঘাড়ে দুটি মাথা আছে যে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে কথা বলবে? শ্রদ্ধেয় রাশেদ খান মেনন তার কলামে লিখেছেন, 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য গত কয়েক বছর ধরে সংবাদপত্রের পাতায়, সেমিনার-আলোচনা সভায় ক্যাম্পেইন চলছে (ভোরের কাগজ ৫ মে') কিন্তু কথাটি সত্যি নয়। বছর দেড়েক আগে রাষ্ট্রপতি প্রথমবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেবার প্রস্তাবটি দেওয়ার পর সারা দেশের একজন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক বা রাজনৈতিক নেতাকেও তার সপক্ষে কথা বলতে না দেখে আমি এই ভোরের কাগজে খুব দুঃখ করে একটি লেখা লিখেছিলাম। আমাকে সমর্থন করে সাধারণ ছাত্র এবং অভিভাবকরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন– কিন্তু দেশের মানুষেরা, যাদের মুখ থেকে এই সম্পর্কে কথা শুনতে চায় তারা কিছু বলেননি। যে কারণেই হোক টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে আমার খুব সংকোচ হয়, তবুও আমি ছাত্র রাজনীতির উপরে দুঃসাহসী সাংবাদিক আবেদ খানের অনুষ্ঠান 'ঘটনার আড়ালে'তে হাজির হয়েছিলাম। সেখানে আমি যা বলেছিলাম সেটা দেখানো হয়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি টেলিভিশনে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান করার উপরে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে যে ক্যাম্পেইন হয়েছে সেটি করেছে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছাত্ররাই। খবরের কাগজ সেটি লিপিবদ্ধ করেছে মাত্র, তার বেশি কিছু করেনি। দেশের সচেতন কিছু মানুষও লেখালেখি করেছেন কিন্তু তারা সবাই জানেন, যেখানে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সেখানে খবরের কাগজের চতুর্থ পৃষ্ঠায় কিছু অক্ষরের মূল্য কতটুকু– এতে মনের ক্ষোভটুকু প্রকাশ করা যায় কিন্তু তার বেশি কি কিছু হয়?

কাজেই ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটুকু কোনো চাপ থেকে আসেনি– সারা দেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছে তা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন, দেশের মানুষের সোজা-সাপটা হিসাব অনুযায়ী এই অবস্থা আর চলতে পারে না। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হলে ছাত্র-কর্মীদের সহায়তা না পেয়ে যেটুকু ক্ষতি হবে, তার থেকে অনেক বেশি লাভ হবে সাধারণ দেশবাসীর সমর্থন থেকে। এই অত্যন্ত সহজ সত্যটুকু অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও বুঝতে হবে, হাতেগোনা হাজারখানেক কর্মী কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি দেশের কয়েক

কোটি ভোটার বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তারা কি হল দখল করতে চান নাকি জাতীয় সংসদ দখল করতে চান?

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে একটা 'যদি' রয়েছে– আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যদিটি তত কঠিন নয়। দশ-বার জন মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে সে রকম ক্ষতি হয় না, কিন্তু যখন সারা দেশের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় তখন তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে গ্রহণ না করে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলো কি গ্রহণযোগ্য? খবরের কাগজে বিবৃতি ছাপানো খুব সহজ কিন্তু তারা কি এই বিবৃতি ছাত্র রাজনীতির কারণে ভুক্তভোগী একজন মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন? যে মা তার সন্তানকে কাটা রাইফেলের গুলিতে হারিয়েছে, যে বাবা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চার বছরের শিক্ষা কার্যক্রমকে আট বছর ধরে টেনে আনছে, যে শিক্ষক পরীক্ষায় নকল ধরে লাঞ্ছিত হয়েছে, রাস্তা অবরোধে যে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝড়বৃষ্টি, রোদে রাস্তার পাশে বসে আছে বা সময়মতো চিকিৎসাকেন্দ্রে নিতে না পেরে প্রিয়জনকে হারিয়েছে, যে শ্রমিক টেন্ডারবাজির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কাজ করতে না পেরে বুভুক্ষু থেকেছে, তাদের কাছে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দরা কি ছাত্র রাজনীতির মাহাত্ম্য বোঝাতে পারবেন? সোজা কথায় সারা বাংলাদেশে কি একজন মানুষও আছে যে কোনো না কোনোভাবে ছাত্র রাজনীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি? আমি লিখে দিতে পারি– একজনও নেই। সাধারণ মানুষের সেই ক্ষোভকে সম্মান করার সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই উপলব্ধিটি এসেছে, অন্যদেরও আসবে– দেশের মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করতে হলে না এসে উপায় নেই।

২.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে একটি 'যদি' ছাড়াও আরো একটি 'কিন্তু' রয়েছে। তিনি বলেছেন, ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন নয় 'কিন্তু' অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন। এই বক্তব্যটি পড়ে অনেকেই বেশ দুশ্চিন্তিত হয়েছেন। এর অর্থ কি রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিতে হলে আওয়ামী লীগকে কিছুই করতে হবে না। কারণ ছাত্রলীগ কাগজে-কলমে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন নয়! সমস্ত দায়-দায়িত্ব অন্যান্য রাজনৈতিক দলের?

এ ব্যাপারে আমি সবাইকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উদ্ধার করার জন্য শুধু আওয়ামী লীগ নয়, সরকারের একটা বড় অংশ তৎপর ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্বায়ত্তশাসিত না হত আমাকে সম্ভবত খাগড়াছড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত (খাগড়াছড়ি আমার খুব প্রিয় জায়গা কিন্তু আমি সেখানে আপন ইচ্ছায় যেতে চাই)। আমি রাজনৈতিক দল এবং সরকারকে আলাদাভাবে দেখতে ভালবাসি কিন্তু দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করতে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি।

www.BanglaBook.org

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় সাজা দেওয়ার ব্যাপারটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্যাপারটি মনে রেখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বে পদে পদে এই ছাত্রদের ব্যবহার করে বাধা দেওয়া হয়েছে। একটি ছোট শিশু যখন অভিমান করে পা দাপায় জগৎ সংসারের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু যখন দেশের সুবৃহৎ দল এবং তার সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অভিমান করে পা দাপায় তখন তার ধাক্কা সামলানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সেটি তার নীতি বজায় রেখে একেবারে নিরপেক্ষভাবে মাথা উঁচু করে থাকতে পারে– এই সহজ সত্যিটি কবে সবাইকে বুঝানো সম্ভব হবে?

ছাত্ররাজনীতি 'যদি' ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার আগে এই 'কিন্তু'টিও নিষ্পত্তি করতে হবে। কাগজে-কলমে কী আছে আমার জানা নেই কিন্তু বাস্তবে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনটি অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠন থেকে এক বিন্দু কম অঙ্গ সংগঠন নয়।

৩.

যাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা রয়েছে তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে ছাত্র রাজনীতির সপক্ষে উক্তি করেন। আমি নিশ্চিত তাদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত নন, এক সময়ে ছাত্র জীবনে আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তাদের বুকের ভিতরে সেই মহান আদর্শের সংগ্রাম নিয়ে ভালবাসা এবং নষ্টালজিয়া রয়ে গেছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবটি শুনে তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এটি হচ্ছে মাথাব্যথা কমানোর জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো। কথাটি শুনতে বেশ শোনায় কিন্তু সেটি সত্যি নয়। অতীতে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা 'মাথার' মতো ছিল, এখন নেই। ছাত্র রাজনীতি এই মুহূর্তে সারা দেশে যে ভূমিকা পালন করছে সেটি একটি ক্যান্সারের মতো। মাথা কখনো কেটে ফেলতে হয় না কিন্তু ক্যান্সার কেটে ফেলা তো যুক্তিযুক্ত চিকিৎসা হতে পারে– সেটা চেষ্টা করা তো অন্যায় কিছু হতে পারে না।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হলেই যে ছাত্ররা একটি নপুংসক অর্থব সমাজে পরিণত হবে আমি সেটা বিশ্বাস করি না। তার রাজনৈতিক অধিকার কেউ তার থেকে কেড়ে নেবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে সে কী করতে পারবে বা পারবে না সেটি নিয়ে বিধিনিষেধ থাকতে পারে কিন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে মূল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে যদি রাজনীতি করতে চায় কেউ তাকে বাধা দেবে না। কে জানে তখন যেসব ছাত্র দেশের প্রকৃত রাজনীতিতে অংশ নেবে তারা হয়ত সত্যিকারের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গড়ে উঠবে, কারণ তারা রাজনীতিতে অংশ নেবে ত্যাগ স্বীকার করে– হলের সিট, ছাত্র সংসদের বাজেট, টেন্ডারবাজির খবরার জন্য নয়। আমাদের দেশের জন্য সেটা যে একটা সুস্থ পদক্ষেপ নয় সেই কথাটি কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবেন?

৪.

সন্ত্রাস শব্দটি ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক দিকটি প্রকাশ করার জন্য কে প্রথম ব্যবহার করেছিল আমি জানি না কিন্তু কাজটি ভালো হয়নি। খুন হচ্ছে খুন, ডাকাতি হচ্ছে ডাকাতি, চুরি হচ্ছে চুরি, রেপ হচ্ছে রেপ, কব্জি কেটে ফেলা হচ্ছে কব্জি কেটে ফেলা এবং রগ কেটে ফেলা হচ্ছে রগ কেটে ফেলা–ছাত্রদের করা এই ধরনের ভয়াবহ অপরাধকে সন্ত্রাস নামক হালকা এবং নিরীহ একটা শব্দ দিয়ে অপসারণ করে দেওয়া একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। দেশের সাধারণ নাগরিক এই অপরাধ করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, বিচার এবং শাস্তি হয় (অন্তত চেষ্টা করা হয়) কিন্তু অপরাধী যদি ছাত্র হয় তাহলে অদৃশ্য ইনডেমনিটি আইন তাদের রক্ষা করে। বড় ধরনের সংঘর্ষ হলে এক দল লাল-নীল শিক্ষক যারা মার খেয়েছে তাদের পক্ষে এবং অন্য এক দল লাল-নীল শিক্ষক যারা মার দিয়েছে তাদের পক্ষে বিবৃতি দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলররা যারা পিটিয়েছে এবং যারা পিটুনি খেয়েছে তাদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে বিরিয়ানি খান। সব দেখে শুনে দেশের সাধারণ মানুষ গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে দেয়। সাধারণ ছাত্ররা নিজেদের ছাত্র পরিচয় দিতে লজ্জা পায় এবং দেশের রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আচ্ছা মতো বকে দিয়ে আসেন এবং আমরা শিক্ষকেরা মাথা নিচু করে সেই বকুনি হজম করি।

যে দেশের শিক্ষক এবং ছাত্র নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায় সেই দেশের কাছে আমরা কি আশা করতে পারি। কেন আমরা এই অপমান সহ্য করে যাব?

৫.

ছাত্র রাজনীতির বড় বড় খুন, জখম, অগ্নিবর্ষণ এবং বোমাবাজির খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়, তাই দেখে অনেকে মনে করতে পারেন সেটাই বুঝি সমস্যা। সত্যি কথা বলতে কি, যারা ছাত্র রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তারা সবাই বলেন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, এই সন্ত্রাসটি দূর করে দিলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। আমি তাদের সবাইকে সবিনয়ে জানাতে চাই, এর থেকে বড় অসত্য আর কিছু নেই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি, ছাত্র রাজনীতির অঘটন ঘটানোর জন্য দায়ী ছাত্রের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা। তারা যদি নিজেরা নিজেদের সঙ্গে হাতাহাতি করে, দুই চারটি খুন করে, কয়েক কোটি টাকা এদিক সেদিক করে, একটি দুটি ঘর পুড়িয়ে, কিছু শিক্ষক, কিছু ভাইস চ্যান্সেলরকে নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দিত আমার বিশেষ কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সবচেয়ে নোংরা অংশ সেটুকু নয়। ছাত্র রাজনীতির সবচেয়ে নোংরা অংশ হচ্ছে সেই অংশটুকু, যেটা খবরের কাগজে খবর হিসেবে ছাপা হয় না। যেটি ধীরে ধীরে ক্যান্সারের মতো পুরো ছাত্র সমাজকে বেঁধে ফেলেছে।

দু'একটি উদাহরণ দিই। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় একটি ভালো ছাত্র অনেক দেরি করে পরীক্ষা দিতে এসেছে। কারণ ছাত্র নেতারা তাকে হুমকি দিয়েছে সহজ প্র্যাকটিক্যালগুলো তারা ভাগাভাগি করে নেবার আগে যেন সে না আসে।

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত উৎসাহী একটা ছেলে নিরপেক্ষভাবে ইলেকশানে দাঁড়াতে চেয়েছিল– তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, বলে দেওয়া হয়েছে সে যেন না দাঁড়ায়, দলীয় প্রার্থী তাহলে ইলেকশানে জিততে পারবে না। পরীক্ষার আগে পরীক্ষা পেছানোর জন্য দাবি চলে আসে, সেটি মেনে না নিলে 'নিয়মতান্ত্রিক' ভাবে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা শুরু হয়ে যায়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ করে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো না হলে ধর্মঘট ডাকা হবে। ধর্মঘটের সময় সমাবর্তনের সকল কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল এবং শহরের এসপি এবং ডিসি পর্যন্ত এই নেতাদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য ছুটে এলেন।

এই ধরনের ছোটখাটো ঘটনা কখনো খবরের কাগজে ছাপা হয় না। কিন্তু সবার অগোচরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে থাকে। একজন সাধারণ নিরীহ ছাত্র আস্তে আস্তে ভীতু কাপুরুষে পরিণত হয়। একজন শিক্ষক চেষ্টা করে করে এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে cynic হয়ে যান।

কাজেই যারা মনে করেন বড় বড় খুন জখম বন্ধ করলেই ছাত্র রাজনীতি ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যাবে, তারা দেশের প্রকৃত খবর রাখেন না।

৬.

রাষ্ট্রপতির অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে সম্মত হয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যে এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া বিবৃতি দিতে শুরু করেছেন– শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। বিবৃতি বা লেখালেখি একপক্ষীয়, এর কোনো জবাবদিহিতা নেই, থাকলেও সেটি খুব সময়সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে আমি একটি সহজ প্রস্তাব দিতে চাই। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে টেলিভিশনের সেই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়ে থাকলে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে টেলিভিশনের সামনে নিয়ে আসা হোক, আমরা তাদের কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তারা আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

প্রশ্নগুলো হবে খুব সহজ প্রশ্ন। শুরু করা হবে এই প্রশ্নটি দিয়ে, আপনার ছেলেমেয়ে কতজন– তারা কোথায় পড়াশোনা করে?

ভোরের কাগজ

১৩ই মে, ১৯৯৮

নিউক্লিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ

১.

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে আমাকে একবার একটা কাজে লস আলামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে যেতে হয়েছিল। ফিনিক্স এয়ারপোর্টে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে লস আলামস রওয়ানা দিয়েছি। পাহাড়ের উঁচুনিচু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, প্রায় অর্ধশত বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এই পাহাড়ি পথে লস আলামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে হাজির হয়েছিলেন। তাদের সমস্ত দেশ থেকে একত্র করা হয়েছিল নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করার জন্য। এই ল্যাবরেটরির অতীত এবং বর্তমানের নানা ঐতিহ্য এবং গৌরব থাকলেও আমার কাছে এটি নিয়ে কৌতূহলের মূল কারণ ছিল একটিই– এটি সেই জায়গা যেখানে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে আমার নিজের কাজ শেষ করে আমি গিয়েছিলাম সেখানকার মিউজিয়ামটি দেখতে। পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির সকল ইতিহাস সেখানে সযত্নে রক্ষা করা আছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের বুঝানো হয়েছিল জার্মানি নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করছে। বিজ্ঞানীরা হিটলারের ভয়েই হোক কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক সামরিক শক্তিকে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সেটি ব্যবহার করল জাপানের ওপর, একবার নয়– পর পর দুবার। যুদ্ধ শেষ করার জন্য সত্যি সত্যি সেটি ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল কি না সেটি নিয়ে এখনো বিতর্ক শোনা যায়, তবে যে তথ্যটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, হিরোশিমা এবং নাগাসাকিকে একেবারে গোড়া থেকে নিউক্লিয়ার বোমার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। অন্যান্য শহরে ব্যাপক বোমা ফেলা হলেও এই শহর দুটিতে একটিও বোমা ফেলা হয়নি। নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হলে একটা জনপদে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার জন্য যুক্তরাষ্ট্র খুব আগ্রহী ছিল।

লস আলামসের সেই মিউজিয়ামটি আমার জন্য একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মতো ছিল। যে বোমা জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকির কয়েক লাখ মানুষকে কয়েক মুহূর্তের মাঝে হত্যা করেছিল, এই মিউজিয়ামে আমি প্রথমবার সেই বোমার একটি প্রশস্তি গাঁথা দেখতে পেলাম। পুরো মিউজিয়ামটিকে সাজানো হয়েছে এমনভাবে যেন সাধারণ দর্শকরা মনে করেন নিউক্লিয়ার বোমা একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস– এটি মানুষকে হত্যা করে না, এটি পৃথিবীতে শান্তি আনে। পৃথিবীতে যত বেশি নিউক্লিয়ার বোমা থাকবে পৃথিবীতে শান্তি তত বেশি নিশ্চিত হবে! নিজের চোখে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না যে পৃথিবীর হত্যালীলার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে মারণাস্ত্র তাকে নির্দোষ এবং পৃথিবীর মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটা প্রযুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

www.BanglaBook.org

লস আলামসের মিউজিয়ামে পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত প্রথম ও দ্বিতীয় নিউক্লিয়ার বোমার ছবি এবং ইতিহাস দেখতে দেখতে আমি নিজের অজান্তে শিউরে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই বোমা কি সত্যিই আবার কখনো পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে ? সেই ব্যবহারকে আবার একটি প্রয়োজনীয় নৈতিক ব্যবহার হিসেবে পৃথিবীর মানুষকে বোঝানো হবে ?

২.

ওয়াশিংটন ডিসিতে সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মিউজিয়ামগুলো রয়েছে। তার মাঝে সবচেয়ে চমকপ্রদ মিউজিয়ামটি হচ্ছে এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে রাইট ব্রাদার্সের প্রথম প্লেনটি থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসা ভয়েজার, গার্ডাডের প্রথম রকেট থেকে শুরু করে এপোলো এগার ক্যাপসুল, ভি-টু মিসাইল থেকে শুরু করে চাঁদের মাটি- সবকিছু রয়েছে। আমি বেশ অনেকবার সেখানে গিয়েছি কিন্তু ১৯৯৬ সালে গিয়েছিলাম একটি বিশেষ জিনিস দেখতে। এনোলা গে নামে যে বিমানটি হিরোশিমাতে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমাটি ফেলে এসেছিল সেই বিমানটিকে সেবার এই মিউজিয়ামে এনে রাখা হয়েছে।

মিউজিয়ামে এনোলা গে'র দিকে তাকিয়ে আমি আবার নিজের অজান্তে শিউরে উঠেছিলাম। প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর আগে এই বিমানটি পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা বহন করে নিয়ে হিরোশিমার উপরে ফেলে এসেছিল, চোখের পলকে একটি শহর ভস্মীভূত হয়েছিল, লক্ষাধিক লোক জীবন হারিয়েছিল- ব্যাপারটি চিন্তা করে কেমন জানি অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে হতচকিত করেছিল সেটি এই বিমান বা বিমানের যন্ত্রপাতি নয়, নিউক্লিয়ার বোমা বা তার যন্ত্রাংশ নয়, তার পিছনের ইতিহাস বা ইতিহাসের অংশ নয়, আমাকে হতচকিত করেছিল এনোলা গে'র বৈমানিকদের ভিডিও সাক্ষাৎকার। বৈমানিক এবং ক্রুদের বয়স হয়েছে, তারা তাদের যৌবনের সেই ঐতিহাসিক অভিযানের কথা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে বলেছেন। পৃথিবীর নৃশংসতম, হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েও তাদের মনে এতটুকু বিকার নেই, এতটুকু অপরাধবোধ নেই। তাদের একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা হাসিমুখে অত্যন্ত গর্বভরে সেই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে এসেও তাদের ভিতরে বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য নেই।

আমার মনে হয় নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ের কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে পুরো মানব জাতিকে হত্যা করা যেতে পারে কিন্তু তার জন্য কেউ এতটুকু অপরাধবোধ অনুভব করে না। পুরো ব্যাপারটি কয়েকজন যুদ্ধবাজ নেতার একটি সিদ্ধান্ত এবং কয়েকটি বোতাম টেপার মতো সহজ। হত্যা আর হত্যা নয়- এটি যেন একটি খেলা, একটি ভিডিও গেম। হত্যাকাণ্ডের কোনো বীভৎসতা দেখতে হয় না, অপরাধবোধে ভুগতে হয় না, নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে বসে শত শত মাইল দূরের শত সহস্র মানুষকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়।

৩.

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ ছাড়া আরো কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কি না সেটি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলেও জল্পনা কল্পনা হয়। পৃথিবীর অনেক বড় গবেষণাগার বহু অর্থ ব্যয় করে মহাজাগতিক প্রাণের সঙ্কেত শোনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই বিষয়ে উৎসাহী অনেক বিজ্ঞানী হিসাব কষে বের করেছেন, আমাদের গ্যালাক্সিতেই ১০ হাজারের বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার কথা। তাদের সঙ্গে আমাদের কখনো দেখা হবে কি না সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তারা সবাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সেটা নির্ভর করে সেই প্রাণীটির ওপর-তারা যদি স্বেচ্ছা-ধ্বংসকারী প্রাণী হয় তাহলে হয়ত তারা অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই এক সময় নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে।

পৃথিবীতে যে পরিমাণ নিউক্লিয়ার অস্ত্র রয়েছে সেটি ব্যবহার করে পৃথিবীকে একবার নয় অসংখ্যবার ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় মানুষের স্থায়িত্বকাল ধর্তব্যের মাঝেই নয়, আধুনিক মানুষ বা হোমোস্যাপিয়েন এসেছে মাত্র ৫০ হাজার বছর আগে। পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসের সেটি লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়- কিন্তু এই সময়ের মাঝেই মানুষ সমস্ত পৃথিবীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে ৫০ বছরের ভিতরে, সেই যুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে। কেউ কি জোর দিয়ে বলতে পারবে যে তৃতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে না এবং সেখানে পৃথিবীর জমিয়ে রাখা সকল অস্ত্রকে ব্যবহার করে পুরো পৃথিবীকেই ধ্বংস করে ফেলা হবে না ?

৪.

বাংলায় নিউক্লিয়ার বোমাকে আণবিক বা পারমাণবিক বোমা বলে উল্লেখ করা হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটি তাদের সঠিক নাম নয়। অণু বা পরমাণুর সঞ্চিত শক্তি থেকে এই বোমার শক্তি বের হয়ে আসে না। এর শক্তি আসে নিউক্লিয়াস থেকে তাই এর প্রকৃত নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ার বোমা। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের একটি বিশেষ আইসোটপের একটি নির্দিষ্ট ভর একত্র করতে পারলে চেইন রি-একশন শুরু হয়। নিউক্লিয়ার রি-একটরে এই চেইন রি-একশনকে নিয়ন্ত্রণ করে শক্তিটুকু ব্যবহার করা হয়, নিউক্লিয়ার বোমায় এটি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সম্পন্ন করা হয়- এটাই হচ্ছে পার্থক্য। যে ভরের আইসোটপে এই অনিয়ন্ত্রিত চেইন রি-একশন শুরু হয় তাকে বলে ক্রিটিক্যাল মাস (Critical mass)। নিউক্লিয়ার বোমার ইতিহাসে গোড়ার দিকে সেটি ছিল একটি অত্যন্ত গোপন তথ্য। কম্পিউটার সহজলভ্য হওয়ার পর ক্রিটিক্যাল মাসটি আর এমন কিছু গোপন নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝেই এটা হিসাব করে বের করে ফেলে, এটি রাষ্ট্রীয় সামরিক গোপন তথ্য বলে এফবিআই এসে তাদের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগাভাগি হবার পর তার নানা ভগ্নাংশ থেকে এবং পূর্ব ইউরোপের নানা রিএকটর থেকে হঠাৎ করে

www.BanglaBook.org

বোমা বানানোর উপযোগী আইসোটপ খোয়া যাওয়ার খবর শোনা যেতে থাকে। তখন হঠাৎ করে পাশ্চাত্য দেশগুলো খুব দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়ে যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা বুঝি কোনো জনবহুল দেশে একটি নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে বসে। নিউক্লিয়ার বোমার প্রযুক্তি এখন সহজ আক্ষরিক অর্থে জলবৎ তরলং। ৫০ বছর আগে এটি দুঃসাধ্য প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার ছিল– এখন নয়। আমি নিজে সন্ত্রাসীদের জন্য নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর কার্যকর নকশা দেখেছি। পাশ্চাত্য দেশ যদি ভয় পেতে শুরু করে যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা এটা তৈরি করে ফেলবে, তাহলে একটা দেশের পক্ষে সেটা আর এমন কী কঠিন ? বিশেষ করে সেই দেশসমূহ যদি পরবর্তী জীবন ঘাস খেয়ে কাটাতে রাজি হয় ?

৫.

ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। কথাটি আমি এতদিন বিশ্বাস করতে রাজি ছিলাম। ভোটারের সংখ্যা এবং রাষ্ট্রচালনার জন্য নির্বাচনের পদ্ধতি দিয়ে বিবেচনা করা হলে সত্যিই এটি সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু মে মাসের ২ তারিখের পর হঠাৎ করে আমার মনে হচ্ছে কথাটি কি এখনো সত্যি ? যে দেশের অসংখ্য মানুষ এখনো অভুক্ত, অশিক্ষিত, যাদের মাথার উপরে আশ্রয় নেই, চিকিৎসার সুযোগ নেই, জীবনে সত্যিকারের কোনো স্বপ্ন নেই, তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার যদি তাদেরকেই উপেক্ষা করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করতে পারে তাহলে গণতন্ত্র কথাটির কার্যকারিতা কোথায় থাকল ? বোমা ফাটানোর আনন্দে মিষ্টি খাওয়া-খাওয়ি যারা করেছে এবং মাঠেঘাটে দুঃসহ দারিদ্র্যে যারা জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের মাঝে দূরত্ব কত যোজন সেটা কি কেউ হিসাব করে দেখেছে ?

ভারতবর্ষের অর্থনীতির ভিত্তি মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে বলে জানি, বাইরের পৃথিবীর লোক দেখানো হম্বিতম্বি শেষ করে সত্যিই যদি অর্থনৈতিক অবরোধ দেওয়া শুরু করে ভারতবর্ষ তবু হয়ত টিকে যাবে–পাকিস্তানের সেই সম্ভাবনা কম বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা শুরু হয়েছে। আশির দশকে রোনাল্ড রিগান তার অবাস্তব 'স্টার ওয়ার' প্রজেক্ট শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জোর করে টেনে এনে তাদের যে রকম বারটা বাজিয়ে দিয়েছিল এখানেও অনেকটা সে রকম মনে হয়। ভারতবর্ষের তুলনায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত অনেক নাজুক, ধার্মো নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করতে সক্ষম ভারতবর্ষ নিউক্লিয়ার বোমার এই অসম প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকে টেনে এনে তাদের অর্থনৈতিক ভিতকে টলটলায়মান করে দিচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রতিযোগিতা একেবারে শিশুদের ছেলেমানুষী প্রতিযোগিতার মতো। ভারতবর্ষ পাঁচটি নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়েছে বলে পাকিস্তানকে হেনতেন যেকোনো ভাবেই ছয়টি বোমা ফাটাতেই হবে। মজার ব্যাপার হল, এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ছয়টি বোমা ফাটানো হয়নি– শুধু সেইভাবে খবরটি ছড়ানো হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে ছলনা করা যায় সেটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কারণ কাছাকাছি সিসমিক স্টেশন থেকে

খুব সহজেই এই সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমরা পাকিস্তানকে খুব কাছে থেকে দেখেছি বলে কিছুতেই অবাক হই না– তা না হলে তাদের নিউক্লিয়ার বোমা প্রজেক্টের সর্বোচ্চ ব্যক্তি যে ইউরোপে চুরির অপরাধে চার বছরের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয়ে আছেন, সেটি শুনেও আমরা কি চমকে উঠতাম না ?

নিউক্লিয়ার বোমা ছেলেমানুষী কিছু নয়। বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইসোটপকে মুহূর্তের মাঝে চেইন রি-একশনে বিস্ফোরিত করতে হয়। এগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাঝেও ভয়ঙ্কর ঝুঁকি রয়েছে। ঠিকভাবে কাজ না-করা একটি বোমা এই পরিবেশের উপর কি পরিমাণ ঝুঁকির সৃষ্টি করে সেটি কল্পনা করাও কঠিন। দুই দেশের সাধারণ মানুষ এই প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় উন্মত্ত– ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সঙ্গে এর কোনো পার্থক্য নেই। বোমা তৈরি এবং বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে ফুটবলের গোল বা ক্রিকেটের উইকেটের কোনো পার্থক্য নেই। নিউক্লিয়ার বোমার মতো ভয়ঙ্কর জিনিস যদি ফুটবল খেলার পর্যায়ে চলে আসে, তাহলে কি সারা পৃথিবীর মানুষের আতংকিত হওয়ার কারণ নেই?

এই নিউক্লিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সবচেয়ে অবিশ্বাস্য অংশ হচ্ছে এই দুই দেশের রাষ্ট্র নেতাদের আস্ফালন। ভারতের নেতৃবৃন্দ নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করার হুমকি দিয়েছেন, পাকিস্তানের নেতারা বলেছেন প্রয়োজন হলে তারা পুরো জাতি ঘাস খেয়ে থাকবে (তাও পেটভরে নয়, ছেলেপিলে নিয়ে আধপেটা)– তবুও নিউক্লিয়ার শক্তি হিসেবে তাদের দাঁড়াতেই হবে। যাত্রার সখে জরির পোশাক পরা টিনের তরবারি হাতে রাজ রাজড়াদের মুখে এই ধরনের উক্তি মানিয়ে যায় কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রকাশ্যে এই ধরনের উক্তি কীভাবে করেন ? অর্থনৈতিক অবরোধে দেশের মানুষদের যদি সত্যি ঘাস খেয়ে থাকতে হয় তখন এই হাস্যকর উক্তিগুলোর কথা কি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাবে ?

পৃথিবীর আরো কিছু দেশের হাতে গোপন নিউক্লিয়ার বোমা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়– সাউথ আফ্রিকা সে রকম একটি দেশ বলে সন্দেহ করা হত। নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার ক্ষমতায় এসে এই নিউক্লিয়ার ক্ষমতার দম্ভ থেকে তার দেশকে মুক্ত করেছেন। দেশের নেতৃত্ব যদি মানুষের কাছাকাছি হয় তাহলে অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় না। এ রকম আরো উদাহরণ আছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ক্ষমতার সমীকরণ আমার মতো মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সোজা হিসেবে যে জিনিসটি বুঝতে পারে না সেটি যত চমকপ্রদই হোক তার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই।

৬.

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা, যেটি প্রায় ছেলেমানুষী নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে খেলা হচ্ছে, আমরা তার খুব কাছের দর্শক। আমি আশা করব আমাদের দেশের কোনো দর্শক যেন ভুলেও মনে না করেন এই নিউক্লিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলায় বিন্দুমাত্র সম্মান বা গৌরব রয়েছে। এটি বিজ্ঞানের বড় আবিষ্কার নয়, এটি চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তিও নয়– ৫০ বছর আগে এর খুঁটিনাটি আবিষ্কৃত এবং

www.BanglaBook.org

পরীক্ষিত হয়েছে। দেশের দুস্থ মানুষের সম্পদকে ব্যবহার করে এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মাঝে কোনো বিজয়ী নেই। এই খেলায় একটি মাত্র পরিণতি- সেটি হচ্ছে পরাজয়, মানবতার পরাজয়। বিজ্ঞানের অপূর্ব রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষা করছে, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সম্পদকে ব্যবহার করে সেই রহস্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করতে হয়। দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যকে দূর করতে হয়- তাদেরকে মারণাস্ত্র তৈরির উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করার মতো বড় অপরাধ আর কিছু নয়। একটি নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি থেকেও একটি অভুক্ত শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া অনেক বড় অর্জন। যারা সেই কথাটি জানে না তাদের জন্য বুকের মাঝে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু তো জন্মাতে পারে না।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মানবতাবিরোধী এই নৃশংস নিউক্লিয়ার বোমার ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার দর্শক হিসেবে আমাদের বুকের মাঝেও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। এটি অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, আমাদের দেশের সরকার তাদের বক্তব্যে সেই ঘৃণাটুকু প্রকাশ করতে সাহস পেল না।

একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ মানবতাবিরোধী এই ভয়ঙ্কর অপরাধের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করবে না, সেটি কেমন করে হয়?

ভোরের কাগজ
১০ই জুন ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

ইনডেমনিটি কালচার

১.

দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি নিয়ে? আমার ধারণা সেটি বিদ্যুৎকে নিয়ে নয়, পানিকে নিয়ে নয়, পরিবেশ দূষণকে নিয়েও নয়। সেটি হরতাল-ধর্মঘট এমনকি আইনশৃঙ্খলা বা সন্ত্রাসকে নিয়েও নয়। আমার ধারণা, দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে। এই দেশে যারা থাকেন, যারা এই দেশে পড়াশোনা করেছেন বা যাদের বাচ্চাকাচ্চা কিংবা আত্মীয়স্বজন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছেন তাদের সবাই কখনো না কখনো এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় পচনশীল রূপটা দেখেছেন। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা হয় না, পরীক্ষা পাস করতে হয় শুধু মুখস্থ করে, ছাত্রছাত্রীরা কিছুই শিখছে না, পরীক্ষায় নকল করাটা প্রায় নাগরিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক শিক্ষক ক্লাস ঘরে না পড়িয়ে চুটিয়ে টিউশানি করেন, ছাত্রছাত্রীরা অন্যায় দাবি নিয়ে ভাঙচুর করা শিখে গেছে- এ ধরনের অভিযোগ সবাই নিশ্চয়ই অসংখ্যবার শুনেছে। কথাগুলো এতবার আলোচিত হয়েছে যে, নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না- বলার চেষ্টা করলে নিশ্চিতভাবে সবাই বিরক্তিতে হাই তুলতে শুরু করবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, সেটিকেও আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, সবচেয়ে বড় সমস্যা যে, চোখের সামনে এত বড় সর্বনাশ দেখাতেও আজকাল আমাদের আর কিছু আসে যায় না। আমি এতটুকু অত্যুক্তি করছি না-কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়, যারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত তাদের এদেশের জন্য বা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিন্দুমাত্র মমতা নেই। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই বা কোনো পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু তবু আমি বাজি ধরে বলতে পারব, যারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখেশুনে রাখেন তাদের ছেলেমেয়েদের নিশ্চয়ই পড়াশোনার জন্য এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় না। সম্ভবত তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশোনা করেন- যদি বা এই দেশে পড়াশোনা করেন তাহলে তাদের জীবনের ধরন-ধারণ দেশের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো নয়, দেশে থেকেও তারা প্রায় বিদেশী, এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে। কোনোভাবেই এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের বা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে স্পর্শ করে না। যদি করত তাহলে তারা কিছুতেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার এত বড় সর্বনাশটি এত নিস্পৃহ ঔদাসীন্যতায় গ্রহণ করতেন না।

মাত্র কিছুদিন হল বাজেট ঘোষণা হয়েছে। বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে মিছিল বের হয়ে যায়। বিবৃতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আমি নিজে এত তাড়াতাড়ি বাজেট বুঝতে পারি না, যারা বোঝেন তাদের মাঝে নিরপেক্ষ মানুষদের সঙ্গে কথা বলে আমার বুঝতে হয়। কাজেই, বাজেটে শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে- তার পিছনেও অন্য কোনো রহস্য আছে কি না

সেটাও আমি চট করে ধরতে পারি না। যদি ধরে নিই এর মাঝে কোনো রহস্য নেই, সত্যিই শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তবুও আমি উল্লাসিত হতে পারি না বরং পুরো ব্যাপারটাকে আমার একটা ঠাট্টা বলে মনে হতে থাকে। তার কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমার একটি অসুস্থ, নৃশংস, দানব বলে মনে হয়– সেটি যেন এই দেশের সকল শিশু, সকল কিশোর-কিশোরীকে অত্যাচার করে যাচ্ছে। তার জন্য অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করার একটিই অর্থ হতে পারে; এই অসুস্থ, নৃশংস দানবটি আরো নতুন কৌশলে, নতুন উদ্যমে এ দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরীদের পীড়ন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দানবরূপী শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে একটা সুস্থ রূপ দেওয়া যাবে, ততক্ষণ এর পিছনে আরো বেশি অর্থ বরাদ্দ করে কি হবে ?

আমি কি অহেতুক উত্তেজনা প্রকাশ করছি ? একটি উদাহরণ দিই, তাহলে সবাই বুঝবেন আমার কথায় বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। চট্টগ্রাম এলাকায় এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই বের হয়ে গেল। শুধু যে বের হল তাই নয়–সেটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হল (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি নিজে আমাদের সেই কথা বলেছিলেন)। সরকার মনে হল ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নিলেন, কারণ পরদিন খবর পেলাম তারা খবরের কাগজের লোকজনকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছেন। কোন আইনের কোন ধারায় এটি লেখা আছে আমি জানি না, কিন্তু একটি বিশাল ব্যর্থতার প্রমাণ যদি খবরের কাগজে হাতেনাতে ধরিয়ে দেওয়া যায় তখন সেই লজ্জায় নিজের মুখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যারা সেই ব্যর্থতাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তাদেরকে যে গ্রেপ্তার করা যায় না, সেটি বোঝার জন্য তো আর রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না! কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছিল। প্রশ্নপত্র প্রকাশ হওয়ার প্রথম ভুলটিকে ঢাকার চেষ্টা করা হল খবরের কাগজের কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করে– যেটি এই সিরিজের দুই নম্বর ভুল।

পরীক্ষার আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং অসংখ্য পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে গেছে–এ রকম প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা হবে কি হবে না, সেটা নিয়ে কয়েকদিন জল্পনা-কল্পনা হল এবং কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরীক্ষা হয়ে গেল এবং সেটি ছিল তিন নম্বর ভুল। প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়ে গেলে সেটি দিয়ে যে পরীক্ষা নেওয়া যায় না সেটি যারা জানেন না, তারা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছেন ভেবে আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। তারা কি পাবলিক পরীক্ষার ব্যাপারটি জানেন না ? তারা নিজেরা কিংবা তাদের সন্তানরা কিংবা পরিচিত কেউ কখনো কোনো পাবলিক পরীক্ষা দেয়নি ?

পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাগুলো বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন, পরীক্ষা নেওয়ার আগে নিলে সম্ভবত ব্যাপারটি সবদিক দিয়ে সহজ হত। একটি পাবলিক পরীক্ষা নেওয়ার পিছনে পরীক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি, তার অংশগ্রহণ ছাড়াও আরো অসংখ্য মানুষ, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-অভিভাবকের পরিশ্রম থাকে। পরীক্ষার খাতা বিতরণ এবং সংগ্রহের

বিশাল একটি ব্যাপার থাকে। প্রশ্নপত্র আগেভাগেই প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় সম্ভবত তার গোপনীয়তাটুকু থাকে না। কিন্তু তবুও পুরো ব্যাপারে গোপনীয়তার একটা ভান করতে হয়– সেটাও নিশ্চয়ই কম যন্ত্রণা নয়! তবুও দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাগুলো বাতিল করায় দেশের অসংখ্য মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। চট্টগ্রামের এক অঞ্চলে প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইলের যুগে সেটি যে মুহূর্তে সারা বাংলাদেশের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে যায়নি, সে কথাটি আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না। এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর যে ভুল সিদ্ধান্তের সিরিজটি তৈরি হয়েছিল তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রথমবার একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

পরীক্ষাগুলো বাতিল করার পর দেশের প্রকৃত দৈন্যটুকু প্রকাশ পেতে শুরু করল, পরীক্ষার্থী কিছু ছাত্র এর প্রতিবাদে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য গাড়ি ভাঙচুর জাতীয় উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করে দিল। ১৫–১৬ বছরের কিশোরের চোখে নতুন জীবনের স্বপ্ন থাকার কথা– একটি অন্যায় আবদারের জন্য তাদের কাজে-কর্মে এই নির্বোধ হিংস্রতা থাকার কথা নয়। কিন্তু যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা দেখার জন্য নিয়মিত ক্লাস বন্ধ করে দেওয়ার আন্দোলনকে মুখ বুজে মেনে নেওয়া হয়, সেখানে এটি হয়ত অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অন্যায় দাবি এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ব্যাপক জনসমর্থন থাকতে হয় না। এদেশের ছাত্র বা ছাত্রের মাতা-পিতা কিশোর-তরুণদের জন্য কোনো আইন নেই। দুচারটে খুন, জখম, কাটা কাটা বা অস্ত্রহাতে ধরা পড়েও তাদের কিছু হয় না– কাজেই অল্প কিছু ছাত্র মিলেই কোনো রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তারা মোটামুটি ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়ে যেতে পারে। ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণনা পড়ে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, এটি সেরকম একটি ঘটনা-সরকারকে শক্তহাতে এদের প্রতিহত করতে হবে, তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু তারপর যে ঘটনা ঘটল আমি তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ করে খবরের কাগজে দেখলাম ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতায় কাজ হয়েছে, কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছেন, তারা ঘোষণা দিয়েছেন– বিক্ষুব্ধ কিছু ছাত্রের দাবি অনুযায়ী পরীক্ষাগুলো বাতিল করার সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার আগেই প্রকাশিত প্রশ্ন দেখে দেওয়া পরীক্ষাগুলো বাতিল করা হবে না, এই পরীক্ষাগুলো কর্তৃপক্ষ বৈধ পরীক্ষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

পরীক্ষাগুলো বাতিল করে তারা সারা দেশের সামনে স্বীকার করেছিলেন, প্রশ্নপত্রগুলো সত্যিই পরীক্ষার আগে বের হয়ে গেছে। পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগে বের হয়ে গেলে সেই পরীক্ষার কোনো অর্থ নেই। এই অর্থহীন পরীক্ষাগুলোকে উচ্ছৃঙ্খল কিছু ছাত্রের দাবিতে গ্রহণ করে নিয়ে তারা সারা দেশকে জানিয়ে দিলেন– আমাদের দেশে যারা শিক্ষা ব্যবস্থার দায়দায়িত্ব নিয়েছেন, পরীক্ষার আনুষ্ঠানিকতা, নিরপেক্ষতা বা পবিত্রতা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এটি হবুচন্দ্রের দেশ, এখানে মুড়িমুড়কির এক দর, পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে পরীক্ষা নেওয়া কিংবা না দেখে পরীক্ষা দেওয়া একই ব্যাপার, এই দেশের কাছে

www.BanglaBook.org

দুইই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। যদি আগে থেকে প্রশ্নপত্র দেখে পরীক্ষা দেওয়াকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ ঘোষণা করা যায় তাহলে নকল করা নিয়ে এত হইচই করা হয় কেন? পরীক্ষার হলে নকল করে পরীক্ষা দেওয়া যেটুকু গুরুতর, আগে থেকে প্রশ্নপত্র দেখে প্রস্তুত হয়ে এসে পরীক্ষা দেওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। আমরা যদি বড় অপরাধটিকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করে নিতে পারি, তাহলে তুলনামূলকভাবে ছোট অপরাধটি নিয়ে মাথা ঘামাই কি জন্য? নাকি এই কারণেই এইচএসসি পরীক্ষায় আমরা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়ে নকল করার ব্যাপারটিকে ঢালাওভাবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, সারা দেশে যে এটি নিয়ে একটি সমস্যা রয়েছে সেটি সংসদে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার পর্যন্ত করলেন না। তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলবেন এত বড় অপবাদ তো আমরা দিতে পারি না- নিশ্চয়ই তিনি যেটা বলেছেন সেটাকে সত্যি জেনেই বলেছেন। যে ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সত্য তথ্যটুকু পৌঁছায় না, সেই ব্যবস্থাটুকু দেশের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

পরীক্ষা সংক্রান্ত ভুল সিদ্ধান্তের সিরিজে বাতিল করে দেওয়া পরীক্ষাগুলোকে বৈধ ঘোষণা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল চতুর্থ এবং সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। এটি শুধু ভুল নয়, এটি ছিল নৈতিকতাবিরোধী একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত। এটি একটি কৌতুকহীন উৎকট রসিকতার মতো। এই বিকট রসিকতা দেশের একটি খুব বড় সর্বনাশ করে দিল- তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশের সবাইকে জানিয়ে দিলেন, পড়াশোনার ব্যাপারটি তারা একেবারেই গুরুত্ব দিয়ে নেন না। কিছু ছেলেপিলে লাঠিসোটা নিয়ে কয়েকটা গাড়ি ভাঙচুর করলেই আমরা সম্পূর্ণ অবৈধ জিনিসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করে ফেলি। আমরা অন্যায় এবং অবৈধ জিনিসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করার নতুন ইনডেমনিটি কালচার শুরু করে দিচ্ছি।

এটি মাত্র শুরু হয়েছে- কোথায় শেষ হবে?

২.

শিক্ষা নিয়ে এই উৎকট রসিকতা-পর্যায়টি দিয়ে দেশের দুটি বড় সর্বনাশ সাধন করা হল। এক. একটি সম্পূর্ণ অবৈধ জিনিসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করা হল; দুই. চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেপিলেকে শেখানো হল যে, তারা গুটিকয় গাড়ি ভাঙচুর করে এই সরকারের কাছ থেকে যা ইচ্ছা তাই আদায় করতে পারবে।

৩.

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রসিকতা পর্যায়ে সবচেয়ে বড় সর্বনাশের চিহ্নটি কিন্তু অন্য জায়গায়। সেটি হচ্ছে- এত বড় একটি ব্যাপার ঘটে গেল কিন্তু দেশের কোনো মানুষ এটি নিয়ে মাথা ঘামালো না। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হল না, শিক্ষাবিদরা কোনো বিবৃতি দিলেন না, রাজনীতিবিদরা কোনো কথা বললেন না, কোনো কলাম লেখা হল না- সম্পাদকীয় লেখা হল না। এক ঘণ্টা ইলেক্ট্রিসিটি না থাকার কারণে

ওয়ার্ল্ডকাপ খেলার পুরোটুকু দেখতে না পারলে খবরের কাগজে অনেক বড় প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়। কিন্তু তার তুলনায় এটি যেন কোনো ঘটনাই নয়।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এত বড় একটি অন্যায় নিয়ে কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই দেখে মনে হচ্ছে, আমরা মনে হয় সত্যি বড় বিপদের মাঝে রয়েছি। এটি একটি জিনিসের দিকেই ইঙ্গিত করে- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন চুলোয় গেল সেটি নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই- দেশের কোটিখানেক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ থেকে ব্রাজিলের রোনালদোর খেলা এই দেশের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! সার্টিফিকেট দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার দিন চলে গেছে- সামনের দিন হচ্ছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির তীব্র প্রতিযোগিতার দিন। এই প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসেবে দেশের ১২ কোটি মানুষ বসে থাকবে, নাকি প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে-সেটি নির্ধারণ করতে হবে এখনই। ওয়ার্ল্ড কাপ উত্তেজনায় মনে হয় খেলায় অংশ নেওয়া থেকে টেলিভিশনের সামনে দর্শক হয়ে বসে থাকাতেই আমাদের বেশি আনন্দ।

৪.

দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত এত বড় একটি ব্যাপার নিয়ে যারা এরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সিদ্ধান্ত নেন, আমার মাঝে মাঝে তাদেরকে সামনাসামনি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। ভোরের কাগজ আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠকে আমি একবার সে রকম একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে অনেক বিজ্ঞজনের সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকায় ঐচ্ছিক গণিতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছেড়ে না দিয়ে কেউ কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি নিতে পারে না। তাই সারা পৃথিবীতে যখন কম্পিউটার শিক্ষার একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে তখন আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শুধু কাগজে-কলমে একটি সুযোগ দিয়ে বাস্তবে তাদেরকে সেই সুযোগ থেকে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধর্ম শিক্ষার নম্বর কমিয়ে খানিকটা হলেও সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দেশের মৌলবাদীরা ব্যাপারটি নিয়ে খানিকটা হইচই শুরু করতেই সরকার পুরোপুরি কাপুরুষের মতো আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। আমি গোলটেবিল বৈঠকে সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলাম- মন্ত্রী মহোদয় তার বক্তব্যে দেশের সকল শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং কলাম লেখকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একটি মন্ত্রীসুলভ উত্তর দিয়েছিলেন। আমার কাছে সেটি সদুত্তর মনে হয়নি। কিন্তু সেটি নিয়ে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারিনি, আমার সে সুযোগ হয়নি। আমার মতো একজন মানুষের এসব বিষয় নিয়ে ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে তর্ক করারও কথা নয়। এর জন্য বড় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে। সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রটি ছিল জাতীয় সংসদ।

কিন্তু জাতীয় সংসদে এসব নিয়ে আলোচনা হয় না। একটি শক্তিশালী বিরোধী দল জাতীয় সংসদে বসে থেকে সরকারকে ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে পান থেকে চুন খসতে দিবে না বলে আমাদের যে আশা ছিল, সেটি বহুদিন হল গত হয়েছে। সাধারণত সংসদে যথেষ্ট সংখ্যক সাংসদ থাকেন না- সংসদ বর্জন-ওয়াকআউট

www.BanglaBook.org

সংসদের মূল কালচার হয়ে যাচ্ছে। যখন বর্জন-ওয়াকআউট হয় না, তখন হইচই, গালিগালাজ, দলবাজি হয়–কিছু কিছু ঘটনা এত লজ্জাজনক যে, পুত্র-কন্যার সামনে বসে দেখা যায় না। আমি ছোট ছোট শিশুদের 'সংসদ-সংসদ খেলা' নামে একটি খেলা খেলতে দেখেছি, সেটি কি রকম, আশা করি মাননীয় সাংসদরা শুনতে চাইবেন না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। খবরের কাগজের চতুর্থ পৃষ্ঠা ছাড়া কি আর কোনো উপায় নেই?

৫.

এটি কোনো গোপন ব্যাপার নয় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। অনেক ব্যাপারে আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, পানি বণ্টন চুক্তি, ইনডেমনিটি বিল), আবার অনেক ব্যাপারে আমরা প্রত্যাশা থেকেও বেশি পেয়েছি (পার্বত্য শান্তি চুক্তি, ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর সঠিক স্থান)। অনেক ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি কিন্তু সরকারের আন্তরিক চেষ্টা রয়েছে বলে আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে রাজি আছি (বিদ্যুৎ, সন্ত্রাস)। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে শুধু আমাদের যে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি তাই নয় সেটি পূর্ণ করার কোনো রকম সদিচ্ছা আছে বলেও মনে হয় না (জাতীয় ইস্যুতে বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতা, শিক্ষা)। এ রকম ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের মাথা চাপড়ানো ছাড়া কি আর কিছুই করার নেই? চোখের সামনে শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে পুরোপরি ধ্বংস হয়ে যেতে দেখা কী কষ্টের, সেটা কেউ অনুভব করবে না?

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে হলেই আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। একবার একটি লোককে দেখা গেল দেয়ালে মাথা ঠুকে সে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে, এত বড় যন্ত্রণাতেও তার মুখে হাসি। একজন জানতে চাইল কেন সে হাসছে। মানুষটি বলল, যখন সে দেওয়ালে মাথা ঠোকা বন্ধ করবে তখন কী আরাম হবে সেটা ভেবেই সে হাসি থামাতে পারছে না।

দেশের মানুষের মুখে এর চেয়ে ভালো এক ধরনের হাসি কি তুলে দেওয়া যায় না?

ভোরের কাগজ
২৮শে জুন, ১৯৯৮

আর মুখস্থ নয়

এই গল্পটি আমি শুনেছি এক স্যারের কাছে। অনেকদিন আগে এক বাসায় গিয়ে তার একটি ছোট বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছয়/সাত বছরের প্রাণবন্ত চটপটে কৌতূহলী একটি মেয়ে মাত্র পড়তে এবং লিখতে শিখেছে। স্যার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি লিখতে পারো?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, পারি।'

'কি লিখতে পারো তুমি?'

মেয়েটি শিশুদের সহজাত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'সব লিখতে পারি।'

স্যার খুশি হয়ে বললেন, 'দেখি তুমি কেমন লিখতে পারো।' তিনি আশপাশে তাকালেন, দেখলেন ঘরের কোনায় একটা বিড়াল গুটিসুটি মেরে বসে আছে। মেয়েটিকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বিড়ালকে নিয়েই লিখে নিয়ে আসো।'

ছোট মেয়েটি তখন তখনি কাগজ-কলম নিয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে লিখতে শুরু করল। কাঁচা হাতের লেখায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে উঠে। ছোট শিশুর কাছে বিড়ালটার যা কিছু ভালো লাগে, যা কিছু খারাপ লাগে, যা কিছু মজাদার বলে মনে হয় তার সবকিছুই সেই লেখায় ফুটে ওঠে। স্যার লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলেন, শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর প্রায় সাত-আট বছর কেটে গেছে। হঠাৎ করে আবার স্যারের সঙ্গে সেই মেয়েটির দেখা। এতদিনে মেয়েটি বড় হয়েছে। খুব ভালো একটা স্কুলে পড়ে, ভালো ছাত্রী। স্যার তাকে দেখে উৎসাহিত হলেন, বললেন, 'তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তুমি বিড়ালের ওপর লিখেছিলে মনে আছে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। স্যার বললেন, 'এখন তুমি নিশ্চয়ই আরো সুন্দর লিখতে শিখেছো তাই না?'

মেয়েটি কিছু না বলে লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

স্যার বললেন, 'ঠিক আছে পরীক্ষা হয়ে যাক। কাগজ-কলম নিয়ে এসো।'

মেয়েটি কাগজ-কলম নিয়ে এল। স্যার বললেন, 'কিছু একটা লেখ।'

'কি লিখব।'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

মেয়েটি বলল, 'আপনি বলেন।'

স্যার বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন বিড়াল নিয়ে লিখেছিলে। আবার বিড়াল নিয়ে লেখ।'

'বিড়াল!' মেয়েটা চোখ কপালে তুলে বলল, 'কুকুর-বিড়াল এসব তো ছোট ক্লাসে পড়ায়। এগুলো তো আমরা এখন পড়ি না।'

'পড়ো না তো কি হয়েছে? বানিয়ে বানিয়ে লেখ।'

'বানিয়ে বানিয়ে?' মেয়েটাকে কেমন জানি হতচকিত দেখায়।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ' – স্যার জোর গলায় বললেন, 'বানিয়ে বানিয়ে লেখ।'

মেয়েটা কাগজ-কলম নিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে ফিরে এল, এক দুই লাইন লিখে সেটাও কাটাকুটি করে ফিরে এসেছে। কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'বিড়াল নিয়ে লিখতে পারছি না। নৌকা ভ্রমণ নিয়ে লিখি ? কিংবা বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ? আমার প্রিয় কবিও লিখতে পারি। খুব ভালো করে শিখেছি।'

স্যার মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না। তোমাকে বিড়াল নিয়েই লিখতে হবে। যখন তুমি এইটুকুন ছিলে তখন পেরেছিলে এখন কেন পারবে না ?'

মেয়েটি আবার খানিকক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল সে পারবে না। যে জিনিস পড়ানো হয়নি সেটা আবার কেমন করে লেখে ?

মেয়েটি জন্ম নিয়েছিল চমৎকার সৃজনশীল একটা মন নিয়ে। ধীরে ধীরে সে বড় হল, দেশের খুব ভালো স্কুলে পড়াশোনা করতে করতে এক সময় সে তার সৃজনশীলতাটুকু হারিয়ে ফেলল। ছোটবেলায় তার কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু এখন কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে সে একটি লাইনও লিখতে পারে না। পরীক্ষায় সে খুব ভালো নম্বর পায় কিন্তু তার মাঝে কোনো সৃজনশীলতা নেই। খুব যত্ন করে গত সাত-আট বছরে তার সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করা হয়েছে। তার একার নয়, তার মতো আরো অসংখ্য শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীর।

www.BanglaBook.org

২.

আইনস্টাইন বলতেন 'জ্ঞানের চাইতে বড় হচ্ছে কল্পনাশক্তি।' আইনস্টাইন খুব বড়মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি, তিনি কত বড় বিজ্ঞানী সেটা বোঝার মতো বিজ্ঞানীও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। সেই আইনস্টাইন জ্ঞান থেকেও কল্পনাশক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তার নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে। কারণটি সহজ, জ্ঞান অর্জন করা যায় কিন্তু কল্পনাশক্তি অর্জন করা যায় না। মানুষ কল্পনাশক্তি নিয়ে জন্মায়–সেই অমূল্য শক্তিকে খুব যত্ন করে লালন করতে হয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে মহান কাজগুলো হয়েছে এই কল্পনাশক্তির কল্যাণে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে কল্পনাশক্তির দরকার, যাদের কল্পনাশক্তি নেই তাদের এই পৃথিবীকে দেওয়ার কিছু নেই। তারা বড়জোর পৃথিবীর ঘানি টেনে নেবে–এর বেশি কিছু নয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। এমন কোনো অভিভাবক কি আছেন যিনি বলতে পারবেন যে তার ছেলে কিংবা মেয়ে পরীক্ষার খাতায় নিজের মনের মতো করে একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে বকুনি খায়নি কিংবা কম নম্বর পায়নি ? পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটুকু কি এখন পুরোপুরি প্রশ্ন এবং উত্তর এই দুইভাগে ভাগ করে ফেলা হয়নি ? কোন প্রশ্নের উত্তরে কি লিখতে হবে, সেটা কি একেবারে দাঁড়ি-কমাসহ আগে থেকে ঠিক করা থাকে না ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানি পোলান্ড দখল করে দেশটির মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙে দেওয়ার জন্য সেই দেশের সকল জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করেছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং জামায়াতে

ইসলামীর কর্মীরা ঠিক একই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সকল শিক্ষক বুদ্ধিজীবী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারকে হত্যা করতে শুরু করেছিল। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোকে স্মরণ করে আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি। অথচ আমরা যে স্কুল-কলেজে আমাদের শিশু-কিশোরদের সকল রকম সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে ঠিক একইভাবে একটি অকর্মণ্য অক্ষম জাতি তৈরি করতে শুরু করেছি, সেই কথাটি কেউ কি ভেবে দেখেছে ? শহীদ সৃজনশীলতা দিবস হিসেবেও কি আমরা একটি দিন আলাদা করে রাখব ? একটি দিন কি যথেষ্ট ?

৩.

এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিতে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে ভর্তি পরীক্ষা নিতে হয়। ব্যাপারটি জটিল, সময় সাপেক্ষ এবং ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-অভিভাবক সকলের জন্য একটি মহা যন্ত্রণার ব্যাপার, কিন্তু তবুও এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সবার যেতে হয়। কারণ, আমাদের দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে সত্যিকার মেধার প্রতিফলন ঘটে না। যারা মেধাবী, পরীক্ষায় তারা তুলনামূলকভাবে বেশি নম্বর পায়। কিন্তু এর উল্টোটা সত্যি নয়– যারা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পায় তাদের সবাই মেধাবী নয়। পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ারও একটি কৌশল আছে, মেধাবী না হয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু কৌশলী হয়েও পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আবিষ্কার করা গেছে, পরীক্ষায় অনেক বেশি নম্বর পাওয়া ছেলেমেয়েদের অনেকেই আসলে এক যুগ স্কুল কলেজে থেকে মুখস্থ করার বিদ্যেটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু শেখেনি।

কয়েকদিন হল এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। যারা বিভিন্ন বোর্ডের মেধা তালিকার শীর্ষে আছে, খবরের কাগজে গর্বিত বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখের ছবি ছাপা হয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত সেইসব কিশোর-কিশোরীর ছবি দেখে বড় ভালো লাগে। তাদের সাক্ষাৎকারে প্রায় সবাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত মেধার যাচাই হয় না। সেটি জেনেও তারা প্রচলিত ব্যবস্থার জন্যই নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে। কেউ দিনে ষোল ঘণ্টা প্রস্তুত করেছে, কেউ একাধিক টিউটরের কাছে পড়েছে। কেউ ব্যাচে পড়েছে। ('ব্যাচে পড়া' কথাটি নতুন, সেটি কী আমি এখনো ভালো করে জানি না। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি, শিক্ষকেরা স্কুলের বাইরে প্রায় স্কুলের মতো একটা সিস্টেম দাঁড় করান যেখানে এক সঙ্গে বেশ কয়েকজন পড়ে। এর মাঝে প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের কোনো ব্যাপার নেই। ব্যাচে পড়ার জন্য মোটা টাকা দিতে হয়, ব্যাপারটি ব্যবসায়িক।) দেশের এই মেধাবী ছেলেমেয়েদের মতো যাদের সামর্থ্য আছে তাদের সবাই নিশ্চয়ই এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াশোনা করছে। এই বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যদি তাদের পরিশ্রমের পুরোটুকু সৃজনশীল কাজে ব্যয় করতে পারত তাহলে দেশের কী সুন্দর একটি ব্যাপার ঘটত, কেউ কি কল্পনা করতে পারে ? খবরের কাগজ খুললেই প্রতিদিন খুন-জখমের ভয়ঙ্কর সব খবর দেখতে পাই, কিন্তু দেশের

প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা ধ্বংস করে প্রতিদিন যে একই মাপের অপরাধ করা হচ্ছে, সেই কথাটি কি কেউ লিখবে না?

মেধা তালিকার শীর্ষে যারা আছে এ বছর তাদের সবাইকে ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাদের প্রায় সবাই একবাক্যে ছাত্র-রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছে। প্রাচীন মানুষদের-যারা ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণআন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এসব দেখেছেন। তাদের জন্য ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে মধুর এবং সম্মানজনক একটা স্মৃতি থাকা সম্ভব। কিন্তু যারা আজকাল বাংলাদেশে বড় হচ্ছে, যারা খবরের কাগজ পড়ে, যাদের পরিচিত কেউ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা শিক্ষক কিংবা যারা কোনো একজন 'মধ্যবয়স্ক' ছাত্র নেতাকে কোনোভাবে দেখেছে, তাদের পক্ষে ছাত্ররাজনীতির জন্য এতটুকু মমতা থাকা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে ছাত্র রাজনীতি এবং সন্ত্রাস কথা দুটি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সত্য না মিথ্যা সেটি নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে কিন্তু এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কাজেই নতুন যে প্রজন্ম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মাঝে যে পরিষ্কার একটা বিতৃষ্ণার জন্ম হয়ে গেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজনীতি যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে এর প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়ে আসলে আরো বড় বিপদ ডেকে আনা হবে। সামাজিকভাবে ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য নয় অথচ সমাজে সেটি যদি খুব দাপট নিয়ে টিকে থাকে, তাহলে সেখানে হাজির হবে শুধুমাত্র সুবিধাবাদীরা, আদর্শহীন উচ্ছৃঙ্খলেরা। সুস্থ মনের একটি ছেলেও যদি ছাত্র-রাজনীতিতে অংশ না নেয় তাহলে আমরা এখন ছাত্র রাজনীতির নামে যে তাণ্ডব দেখছি, ভবিষ্যতে তার চাইতে আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর রূপ দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশের যে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্র রাজনীতির এই ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আশা করি তারা ব্যাপারটা জানেন।

৪.

প্রতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী কয়েকদিন আমি এক ধরনের কষ্ট অনুভব করি। কারণ, তার পরবর্তী কয়েকদিন দেশের অনেক কিশোর কিশোরী পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে আত্মহত্যা করে এবং খবরের কাগজে সেই খবরগুলো ছাপা হয়। আমার শুধু মনে হয়, ব্যর্থতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে যে তরুণ কিশোর-কিশোরীরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, যদি কোনোভাবে তাদের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারতাম, তাদের বোঝাতে পারতাম- একটি জীবন বহু মূল্যবান, ছোট একটি ব্যর্থতার জন্য সেই জীবনকে এভাবে ধ্বংস করতে হয় না। আশা করে আছি এক সময় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটুকু সত্যিকারের শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে, শুধুমাত্র বিত্তশালী মানুষের সন্তানের জন্য নয়, গ্রামগঞ্জের অখ্যাত স্কুলের দারিদ্র্য ছেলেমেয়েরাও একই সুযোগ এবং সম্ভাবনা নিয়ে পড়াশোনা করবে, ব্যর্থতার গ্লানি কাউকে স্পর্শ করবে না।

এবারে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। শুধুমাত্র যে অকৃতকার্যদের ব্যর্থতার গ্লানি স্পর্শ করে তাই নয়-

একেবারে শীর্ষে থাকার প্রতিযোগিতায় থাকতে না পারলেও ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতার গ্লানি স্পর্শ করে।

আমি শিক্ষক, আমার জীবিকা অর্জনের জন্য আমাকে প্রায় প্রতিদিনই খাতা দেখতে হয়। আমি জানি, পুরোপুরি গাণিতিক সমস্যা না হলে দুজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পক্ষে পুরোপুরি নিরপেক্ষভাবে একটি পরীক্ষার খাতায় একই মাপে নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়। একই খাতায় দুজন একটু আধটু ভিন্ন নম্বর দেবে। ভিন্ন মানুষ যে ভিন্ন নম্বর দেবে তাই নয়, একই মানুষও দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খাতা দেখলে একটু আধটু ভিন্ন নম্বর দেবে। কাজেই পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরগুলো কখনই আক্ষরিকভাবে নিতে নেই। পৃথিবীর কোথাও নেওয়া হয় না, শতকরা হিসেবে কিছু গ্রেডে ভাগ করে নেওয়া হয়। পরীক্ষায় কেউ প্রথম দ্বিতীয় হয় না, নিজেদের শতকরা হিসেবে কিছু গ্রেডে স্থান নিয়ে নেওয়া হয়। আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মেধা তালিকা তুলে দিয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি চমৎকার একটি প্রস্তাব এবং সত্যি সত্যি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেধা তালিকার শীর্ষে যাওয়ার প্রায় একটি অর্থহীন প্রতিযোগিতা পুরোপরি বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তাদের সকল শক্তি ব্যয় করবে নতুন জিনিস নতুনভাবে শিখতে।

আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন সবাই তার সুফল পেতে শুরু করেছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে- যদি এটি একটু আগে শুরু করা হত তাহলে আমার প্রিয় দুই ছাত্রকে মাত্র এক নম্বরের ব্যবধানের জন্য একজনকে প্রথম এবং আরেকজনকে দ্বিতীয় হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার বিড়ম্বনাটুকু সহ্য করতে হত না।

৫.

আশা করে আছি, একদিন দেশের হর্তাকর্তারা বুঝতে পারবেন, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। ক্রিকেট টিমের পিছনে কোটি কোটি টাকা ঢালা হলে তারা ওয়ার্ল্ডকাপ আনতে পারে, না-ও পারে, কিন্তু শিক্ষার পিছনে কোটি কোটি টাকা ঢালা হলে সেটি জাতির জন্য সত্যিকারের পুরস্কারটি নিয়ে আসবে- সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উদাহরণও নেই যেখানে শিক্ষার পিছনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, অথচ সেই অর্থব্যয় জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়নি।

যতদিন আমরা আমাদের কল্পনার শিক্ষা ব্যবস্থা না পাচ্ছি ততদিন অন্তত আমরা কি আমাদের কল্পনাশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না? আমাদের দেশে অনেক রকম আন্দোলন তো হয়েছে, নতুন একটি আন্দোলন কি শুরু করা যায় না? যেখানে বাংলাদেশের সব স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী মাথা নেড়ে বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আমরা আর মুখস্থ করব না!'

ভোরের কাগজ
১৯শে আগষ্ট, ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

বাংলাদেশ এবং তথ্য প্রযুক্তি

১.

স্ক্রু বসাতে আমরা যে স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করি তার সাথে একটা কমপিউটারের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই এক ধরনের টুল (Tool). আমাদের কাজকর্মে সাহায্য করার একটি যন্ত্র। কিন্তু সারা বিশ্বের সকল সম্ভ্রান্ত শিক্ষাঙ্গনে 'কমপিউটার বিজ্ঞান' নামে একটি বিষয় খোলা হয়েছে কিন্তু কোথাও 'স্ক্রু-ড্রাইভার বিজ্ঞান' দূরে থাকুক 'লেদ মেশিন বিজ্ঞান' ও খোলা হয়নি, তার কারণ কি ? কারণটি সহজ—পৃথিবীর সকল টুল তৈরী হয় একটি বিশেষ কাজ করার জন্যে (এক কাজের জন্যে তৈরী একটি টুলকে অন্য কাজে ব্যবহার করতে গেলে অনেক বিড়ম্বনা হতে পারে, হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে কেউ কখনো স্ক্রু বসানোর চেষ্টা করে দেখেছে ?) কিন্তু কমপিউটার হচ্ছে তার বড় ধরনের ব্যতিক্রম, এটিকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্যে আলাদা করে রাখা নেই। বিজ্ঞানের চুল-চেরা গবেষণা থেকে জ্যোতিষীদের কুষ্টি বিচার করে ভাগ্য গণনা করা হয় কমপিউটার দিয়ে। পাড়ি দেওয়া মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ড্রয়িংরুমে বাচ্চাদের খেলনা নিয়ন্ত্রণ করা হয় কমপিউটার দিয়ে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা কমপিউটার দিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন আবার সেই একই কমপিউটার ব্যবহার করে পেশাদার চোরেরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি করেছে সেরকম উদাহরণ রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীরা কমপিউটার ব্যবহার করে পড়াশোনা করে আবার আমাদের দেশের বড় বড় আমলারা তাদের অফিসের সৌন্দর্য বর্ধন করেন কমপিউটার দিয়ে। এক কথায় বলা যায় একটি কমপিউটার ঠিক কী কাজে ব্যবহার করা যায় সেটি নির্ভর করে যে ব্যবহার করছে তার সৃজনশীলতার উপর। মোটামুটি নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় আমরা এখনো কমপিউটার নামক যন্ত্রটির সত্যিকার ব্যবহার দেখতে শুরু করিনি এবং এই যন্ত্রটি নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

২.

পৃথিবীর সকল শিক্ষাঙ্গনে কমপিউটার নামক যন্ত্রটির নামে 'কমপিউটার বিজ্ঞান' বিভাগ খুলে সেখানে যে অসংখ্য মেধাবী ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকেরা এর রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তার আরো একটি কারণ রয়েছে। সেই কারণটি হচ্ছে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের এত সুন্দর সমন্বয় এত সুন্দর করে আগে কখনো ঘটেনি। এই সমন্বয়টি এত বৈপ্লবিক যে এই প্রথমবার মানুষ মনে করছে তারা বুঝি মানুষের কাছাকাছি একটি যন্ত্র তৈরী করতে পারবে।

মানুষের দেড় কেজি ওজনের মস্তিষ্কে এক হাজার কোটি নিউরন ($১০^{১০}$) রয়েছে। প্রতিটি নিউরন আবার তার সিনাপ্স ব্যবহার করে প্রায় হাজারখানেক নিউরনের সাথে যোগাযোগ রাখে। অনুমান করা হয় মানুষের মস্তিষ্ক তার এই

সিনাপ্টিক যোগাযোগের মাধ্যমে তার স্মৃতিকে ধরে রাখে। প্রতি যোগাযোগে প্রায় এক বাইট তথ্য জমা করে রাখতে পারলে মানুষের মস্তিষ্কের মোট তথ্যকে দশ কোটি কোটি বিট ($১০^{১৫}$বিট) বলে অনুমান করা যায়।

মানুষের চিন্তা করার প্রক্রিয়াটি সিনাপ্সের মাধ্যমে নিউরনের যোগাযোগ সৃষ্টি করার (Fire) সাথে তুলনা করা যায়। মস্তিষ্কের শতকরা দশভাগ নিউরন যদি সেকেন্ডে আনুমানিক দশ বার করে যোগাযোগ সৃষ্টি করে তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় সেকেন্ডে দশ কোটি বার। নিউরনের প্রতিবার যোগাযোগ সৃষ্টি করাকে কমপিউটারের একটি ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশান হিসেবে তুলনা করা হলে মানুষের মস্তিষ্ককে হাজার টেরাফ্লপ কমপিউটারের কাছাকাছি বলে অনুমান করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, কমপিউটারের মেমোরী হবে একশ টেরা বাইটের কাছাকাছি এবং স্পীড হবে হাজার টেরা ফ্লপের কাছাকাছি। সেটাকে মানুষের মস্তিষ্কের সমপর্যায়ের ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতাধারী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে ধরনের কমপিউটার এখন কত দূর।

ইতোমধ্যে একশ টেরাবাইটের সমান কোড করার উপযোগী কমপিউটার তৈরী হয়েছে। কমপিউটারের ক্ষমতা আনুমানিকভাবে প্রতি বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় সে হিসেবে প্রতি সাত বৎসরে একশগুণ বৃদ্ধি পায়। যদি এই গতিটি বজায় থাকে এবং না থাকার কোনো কারণ নেই তাহলে আমাদের ডেস্কটপ কমপিউটার আগামী দুই দশকের মাঝে হাজার টেরা ফ্লপের কাছাকাছি চলে আসবে। বড় গবেষণা ক্ষেত্র বা রিসার্চ কমপিউটার, সুপার বা আলট্রা কমপিউটারের বেলায় সেটি ঘটবে আরো অনেক আগে।

ব্যাপারটি কি কেউ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখেছে ? মানুষের মস্তিষ্কের যে গুণগত উৎকর্ষতার কারণে আমরা চিন্তা নামক একটি জিনিস করতে পারি, ক্রোধ, অভিমান, দুঃখ বা ভালবাসা নামক মানবিক অনুভূতি দিয়ে আলোড়িত হই, সেই একই ধরনের জটিলতা অর্জন করতে যাচ্ছে মানুষের হাতে তৈরী একটি যন্ত্র এবং সেই ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে আমাদের অনেকের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর ইতিহাসে এর থেকে বড় ঘটনা কি আর কিছু ঘটতে পারে ?

হাজার টেরা ফ্লপ কমপিউটার হলেই যে মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে সেটি সত্যি নয়, তাকে তার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে এবং সেটিও করবে পৃথিবীর মানুষ। মানুষের বুদ্ধিমত্তার এই বিশাল আয়োজনে আমরা কোথায় থাকব ? আমি জানি, আমাদের চারপাশে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী সহকর্মীদের মাঝে সেই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অংশ নেয়ার মতো অসংখ্যজন রয়ে গেছেন। তবুও কি আমরা শুধু পিছনে পড়ে থেকে যাব ? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সীমাবদ্ধ থাকবে বিদেশী প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা একটি সেতুর নামকরণ নিয়ে বিতর্কে ? আমাদের বিনোদন হবে টেলিভিশনের সামনে বসে খেলা দেখার জন্যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ? যাদের খেলা দেখার জন্যে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিচ্ছি, তাদের দেশে তো একটি দিনও লেখাপড়া বন্ধ থাকেনি ?

আমাদের এই দীনতা রাখার জায়গা কোথায় ?

www.BanglaBook.org

৩.

আমরা এখন পৃথিবীর যে রূপটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটি বিপ্লবের ফল। প্রায় দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপ্লব নামে এই বিপ্লবটি পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিয়েছিল। যে সকল দেশ এই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল পরবর্তী দুই শতাব্দী তারা পৃথিবীকে শাসন এবং শোষণ করেছে। আমরা তাদেরকে শিল্পোন্নত দেশ বলি। তারা যে তাদের অর্থ, বিত্ত, সম্পর্ক এবং শক্তি দিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, তারা আমাদের ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের অর্থ বিত্ত সম্পদ এবং চাকচিক্য দেখে আমরা এত বিমোহিত হই যে প্রবল আগ্রাসনে তারা যখন আমাদের নিজের সংস্কৃতিকে পদদলিত করে আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই!

শিল্প বিপ্লবে পৃথিবীর রূপ যেভাবে পরিবর্তন হয়েছিল এখন ঠিক সেরকম একটি ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন নতুন একটি বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং এই বিপ্লবের নাম তথ্য বিপ্লব। শিল্প বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিল তারা যে রকম পৃথিবীকে পরবর্তী দুই শতাব্দী শাসন এবং শোষণ করেছে ঠিক সেরকম যারা এই তথ্য বিপ্লবে অংশ নেবে তারা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পৃথিবীকে শাসন এবং শোষণ করবে। শিল্প বিপ্লবে সবাই অংশ নিতে পারেনি, কিন্তু এই তথ্য বিপ্লবে যে কেউ অংশ নিতে পারে। কমপিউটার নামক যে যন্ত্রটির উপর ভিত্তি করে এই তথ্য বিপ্লব শুরু হয়েছে সেটি প্রায় মূল্যহীন একটি যন্ত্র, আমাদের মতো দরিদ্র দেশের আনাচে-কানাচে সেটি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। যোগাযোগ ব্যবস্থা একটু আধুনিক করা হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও পৃথিবীর সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একবার উঁকি দিতে পারে, ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পারবে, তথ্য বিনিময় করতে পারবে। এ দেশে বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের শিক্ষিত করে তুলে তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলে রাতারাতি তারা জন সম্পদে পরিণত হবে। অল্প কিছু সার্বিক সিদ্ধান্ত, একটু সদিচ্ছা, দেশকে নিয়ে ভালবাসা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমাদেরকে তথ্য বিপ্লবের অংশীদার করে তুলতে পারে। শিল্প বিপ্লবে অংশ না নেয়ার কারণে আমরা গত দুই শতাব্দী নিগৃহীত হয়েছি। তথ্য বিপ্লবে অংশ না নিয়ে কি আমরা আবার তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসী হয়ে পৃথিবীর অনুকম্পা ভিক্ষা করে আরো দুই শতাব্দী কাটিয়ে দেব, না কি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াব সেই সিদ্ধান্তটি আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে।

৪.

আমরা ইতোমধ্যে প্রাথমিক কিছু ভুল করে ফেলেছি। তথ্য বিপ্লবে অংশ নেয়ার জন্যে যে জনশক্তি তৈরী করা প্রয়োজন সেটি তৈরী করা শুরু করিনি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত একটি হাস্যকর অব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজ দেশে সত্যিকারের সুযোগ না থাকায় উচ্চ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য দেশ ত্যাগ করে শিল্পোন্নত দেশে পাড়ি দেয়া। সেখানে গিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দীনতা আবিষ্কার করে নিজের মেধার জোরে আবার নিজেকে সুশিক্ষিত করে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করে।

দেশের অসংখ্য বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এভাবে দেশের বাইরে রয়ে গেছেন, তাদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকেও যদি দেশে ফিরিয়ে আনা যেত দেশে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করা যেত। বর্তমান কিংবা ইতঃপূর্বের কোনো সরকারই তাদের ফিরিয়ে আনতে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। কিছুদিন আগে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অসংখ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করলেও মেধাপাচার রোধ কিংবা মেধাবীদের ফিরিয়ে এনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বা উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা কোনো পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।

তথ্য প্রযুক্তিতে অংশ নেয়ার একটি বড় শর্ত হচ্ছে বহির্বিশ্বের সাথে সুদৃঢ় যোগাযোগ। বাংলাদেশের পাশে বঙ্গোপসাগরের নিচে দিয়ে যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানো হয় তখন বাংলাদেশকে সেই নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করার একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। 'বাংলাদেশের সকল গোপন তথ্য বিদেশে পাচার হয়ে যাবে' এই ভয়ে সেই সুযোগটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে এক ধরনের জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করা হয় VSAT বা টেলিফোন লাইন দিয়ে। সেগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যে কারণে ইন্টারনেটের মতো ব্যাপারগুলি এখনো অপরিপূর্ণ এবং ঢাকা কেন্দ্রিক।

বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে এখনো ইন্টারনেট নেই, এটি অতিশয়োক্তি নয়। যেটুকু আছে ঢাকা শহরেই আছে। ঢাকা শহরের বাইরে থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিচরণ করা প্রায় দুঃসাধ্য একটি কাজ। সিলেট শহর থেকে কয়েকবার চেষ্টা করে আমি আমার পুরো মাসের বেতনের সমপরিমাণ টেলিফোন বিল দিয়ে সেই প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছি। ঢাকা শহর হচ্ছে বাংলাদেশ, বাকি দেশটুকু 'আন্দামান' আমার এই ধারণায় আমি আবার নতুন করে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

৫.

যেভাবেই হোক আমাদেরকে তথ্য বিপ্লবে অংশ নিতে হবে। কিছু কিছু ভুল ইতোমধ্যে করা হয়ে গেছে সেগুলি নিয়ে হৈচৈ না করে এই মুহূর্তে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সেই ভুলগুলি যেটুকু সম্ভব সংশোধন করতে হবে। কমপিউটারের ট্যাক্স এবং ভ্যাট কমিয়ে সরকার অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সফটওয়্যার এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিল্পে উৎসাহ দেয়া নিয়েও আজকাল কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। সেটিও খুব উৎসাহের কথা। সত্যিকার অর্থে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে উঠতে হলে আমাদের দক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন হবে, আমাদের এই মুহূর্তে সেই দিকে নজর দিতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চার বৎসরে যত কমপিউটার বিজ্ঞানী বের করছে সেটি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েত অপ্রতুল। আরো অল্প সময়ে বিজ্ঞান এমনকি সমাজ বিজ্ঞানের স্নাতক পর্যায়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে কমপিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বল্প মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স দেয়া শুরু করতে পারে,

www.BanglaBook.org

দেশের প্রয়োজন যাচাই করে যত দ্রুত সম্ভব এই প্রশিক্ষণ শুরু করে দিতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির যোগাযোগ আরও ব্যাপকভাবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের সকল শহরে আই.এস.পি. (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) বসাতে হবে যেন দেশের যে কোনো অঞ্চলের মানুষ এই সুযোগটি ব্যবহার করতে পারে। সরকারের লাল ফিতেকে যেভাবে হোক দূর করতে হবে। এই বিষয়ে অসংখ্য মানুষের উৎসাহ সরকারি বাধা-নিষেধের কারণে যেন মিলিয়ে না যায়।

একই সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা সরকারি পর্যায়ে প্রবাসী বাংলাদেশের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাদেরকে পাকাপাকি বা সাময়িকভাবে হলেও দেশে ফেরার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।

আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বসবাস করছি। আমাদের হাতের কাছে একটি বিশাল সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ যেন কিছুতেই হাত ছাড়া না হয়।

NCPC 1988

স্মরণিকায় প্রকাশিত।

বিচারের শেষ নয়—বিচারের শুরু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি তদন্তকার্য সমাপ্ত হয়ে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। খবরের কাগজের লেখালেখি পড়ে মনে হয়েছে এই তদন্তটির আদৌ শুরু হত কি না সে ব্যাপারে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। আমি দেশের এক কোণায় প্রায় মফস্বলে বাস করি বলে রাজধানী সংলগ্ন সকল তথ্য পাই না। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে মনে হয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ ব্যাপারে খুব শক্তিশালী একটা ভূমিকা নিয়েছে। তাদের চাপের কারণে আমরা যাকে কর্তৃপক্ষ বলি—তারা মোটামুটি বাধ্য হয়ে তদন্ত কার্যটি শেষ করেছেন। যে ঘটনার জন্য তদন্ত শুরু এবং শেষ হয়েছে তার সব ক'টি সাম্প্রতিক ঘটনা নয়, ঘটনার কথাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতেন না সেটাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কাজেই দীর্ঘদিন থেকে যে সকল ঘটনা সহ্য করে নেওয়া হয়েছে হঠাৎ করে সেই সকল ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে তার তদন্ত শুরু করে দেওয়ার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কিংবা দেশের মানুষের বিবেকের একটা চাপ থাকতে পারে। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার বিচার দাবি করে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা একটি মৌন মিছিল করেছিল—শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সেটি ছিল দীর্ঘতম মিছিল। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের স্বাক্ষরসহ একটি চিঠি দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পাঠানো হয়েছিল। মিছিলের সামনে ব্যানারে কি লেখা যেতে পারে সেটি নিয়ে কথা বলার জন্য যারা আমার কাছে এসেছিলেন আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম সেখানে 'রেপ' কথাটির সরাসরি বাংলা প্রতিশব্দ তারা যেন ব্যবহার না করেন। তারা আমার অনুরোধের কারণেই হোক বা নিজেদের রুচিবোধের কারণেই হোক ব্যানারে 'সম্ভ্রমহানী' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যে শব্দটি কলম দিয়ে লিখতে আমাদের সংকোচ হয় সেই অপরাধগুলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে থাকে এবং সেটাকে সহ্য করতে হয় একটা জাতির জন্য, এর থেকে বড় অবমাননাকর কিছু থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের সম্ভ্রমহানী সংক্রান্ত তদন্তকাজ শুরু হওয়ার পর আমি খবরের কাগজে কিছু একটা লিখব ঠিক করেছিলাম। পরে মনে হয়েছে তদন্ত কাজ শেষ হওয়ার পরই সেটা লেখা উচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু তদন্তকার্যে আমি অংশ নিয়েছি। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রহস্যোপন্যাসের তদন্তের মতো নয়, এমনকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা সিআইডি'র তদন্তের মতোও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—সেখানে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি গোপন কোনো ঘটনা নয়, প্রায় সময় সেটি আক্ষরিক অর্থে শত শত ছাত্রছাত্রীর সামনে ঘটে থাকে। তদন্তকাজ শুরু করার আগেই তদন্ত কমিটি সাধারণত পুরো ঘটনাটি আদ্যোপান্ত জানেন। যে ঘটনাটি সবাই জানে সেটি কেন তদন্ত করতে হয় তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। কারণ বাংলাদেশের সবাই জানে, ঘটনাটি জানা এক কথা এবং সেটি কাগজে-কলমে লিখে সাক্ষী দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। কাজেই ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা সবার সামনে ঘটে যাওয়ার পরও সেটি কাগজে-কলমে গোপন থেকে যায়। একটি তদন্ত

www.BanglaBook.org

কমিটির দায়িত্ব সেটুকুই, যে ঘটনার কথা সবাই জানে সেটাকে কাগজে-কলমে লিখে প্রতিষ্ঠিত করা। তদন্ত কমিটি যদি সাহসী হয়ে থাকে তারা সেটি করে, ঘটনাটি চাপা দেওয়ার প্রয়োজন হলে তারা সেটি নিয়ে কালক্ষেপণ করে। কর্তৃপক্ষ যদি তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে গলা টিপে হত্যা করতে চান তারা আরো নানা রকম কৌশল নিতে পারেন, আমি অন্তত একটি ঘটনার কথা জানি যেখানে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপরেও তদন্ত করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যদি সত্যি সত্যি কোনো ঘটনার বিচার করতে চান তাহলে সব সময়েই তারা সেটি করতে পারেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবারে সত্যি সত্যি ঘটনার বিচার করতে চেয়েছেন কিংবা বাধ্য হয়েছেন, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৩ জনকে অপরাধে অংশ নেওয়ার জন্য কেন অভিযুক্ত করা হবে না সেই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

২.

কেউ কেউ মনে করতে পারেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে সেটি সত্যি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে অপরাধের বিচার করতে যাচ্ছে সেটি পড়াশোনা সংক্রান্ত অপরাধ নয়। কোনো ছাত্র ক্লাস না করে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়েনি, সময়মতো ভর্তি না হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হয়নি, এমনকি পরীক্ষায় নকল করতে গিয়েও ধরা পড়েনি। তারা যে অপরাধটি করেছে সেটি মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার কথা প্রমাণ করার জন্য আমরা এই অপরাধটির কথা স্মরণ করিয়ে দিই। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সম্ভবত একমাত্র দেশ যে দেশে এই ভয়ঙ্কর অপরাধের বিচার দেশের আইনে করা হল না। এই অপরাধের বিচার করতে হল আমাদের মতো শিক্ষকদের। শিক্ষকরা বিচার করে কাউকে জেল দিতে পারেন না, ফাঁসি দিতে পারেন না, বড় জোর তাদের এক-দুই বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দিতে পারেন। যাদেরকে বের করে দেওয়া হয় তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুচ্ছ' ডিগ্রির জন্য তারা এখানে আসে না, অপরাধের গ্লানিও তাদের স্পর্শ করে না। পুরো ব্যাপারটি আসলে একটি প্রহসন, দেশের আইনে যাদের বিচার করার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তাদের বিচার করে আসলে 'বিচার' নামক কথাটিকে অপমান করা হয়।

একটি উদাহরণ দিই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য বেশ কিছু ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। যে ছাত্রটি তিন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি পেয়ে দুই বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছে তার ওপরে শাস্তি বহাল করতে গিয়ে দেখা গেল সে এর মাঝে পাস করে বের হয়ে গেছে। যে ছাত্র একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তাদের আর কিছু করা যায় না। আমি যতদূর জানি তিন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সন্ত্রাসী কাজে শাস্তিপ্রাপ্ত সেই ছাত্রটি পুলিশের এসআই হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছে। পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার কথা, কিন্তু এখানে সেটা করা হয়নি। কিংবা কে জানে হয়ত খোঁজ-খবর নিয়েই তাকে পুলিশবাহিনীতে নেওয়া হয়েছে। বিএনপি আমলে যে বিপুলসংখ্যক সেই দলীয় পুলিশ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এখন বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগপন্থী পুলিশ নিতে হবে—দলীয় ব্যানারে সন্ত্রাসী কাজ করা হয়ত একটি সার্টিফিকেট, কলঙ্ক নয়। সন্ত্রাসী কাজকর্ম করতে পারে বলে

যাদের আমরা দেশের সকল নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুলিশবাহিনীতে নিই তাদের কাছে আমরা কি আশা করব? একজন রুবেল, একজন সীমা বা ইয়াসমিন নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হয়ে যায়। কিন্তু যাদের সারা জীবন জেলে থাকার কথা তারাই যখন পুলিশের হর্তাকর্তা হয়ে যায় তখন কত অসংখ্য নাম না জানা রুবেল, সীমা এবং ইয়াসমিন এই দেশের মাটি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কেউ ভেবে দেখেছে?

কাজেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট যে বিচার করতে শুরু করেছে সেটি সত্যিকারের বিচার নয়। তবে সেটি সত্যিকারের বিচারের শুরু হতে পারে। দেশের সবচেয়ে মহান বিদ্যাপীঠের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা তদন্ত করে জাতির সামনে প্রকাশ করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। দেশ এবং দেশের সরকারকে এখান থেকে শুরু করতে হবে, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে বিচার করতে হবে—ঘটনাক্রমে সে ছাত্র হতে পারে কিন্তু তার ছাত্রসুলভ কোনো আচরণের জন্য বিচার করা হচ্ছে না। এই মুহূর্তে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে যেভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু হয়েছে, ছাত্ররাজনীতির দুর্বৃত্তদের ঠিক একই ধরনের ইনডেমনিটি থেকে মুক্ত করে বিচার শুরু করতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি ছোট একটি ঘটনা নয়, জাতি হিসেবে আমরা কি সসম্মানে মাথা তুলে দাঁড়াব নাকি একটি ক্লেদাক্ত পরজীবী আবর্জনায় পরিণত হব—আমরা সেই পরীক্ষার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

www.BanglaBook.org

৩.

আমি শুনেছি মেয়েদের সম্ভ্রমহানী সংক্রান্ত মামলা যখন কোর্টে আনা হয় তখন আইনজীবীদের জেরার কারণে পুরো ব্যাপারটি মেয়েদের জন্য নতুন করে একটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। বিচারের পুরো ব্যাপারটির ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে তাদের আবার নতুন করে যে অসম্মানের ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেটি এক কথায় একটি অমানবিক ব্যাপার। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে লোকলজ্জার ভয়, খবরের কাগজে নাম প্রকাশের ভয়, তথ্য প্রকাশের ভয়। বিচারের এই নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে কেউ যেতে চাইবে না এই তথ্যটি অপরাধীরা জানে বলেই তাদের এই দুঃসাহস।

কিন্তু এ ব্যাপারে কি কিছু করা যায় না? আমি যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালীন সময়ে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে কিছু তরুণ একজন মহিলাকে আক্রমণ করে তার সম্ভ্রমহানী করেছিল। এই মামলাটি যখন কোর্টে এসেছে তখন সকল সংবাদপত্র, টেলিভিশন একটি আশ্চর্য ভূমিকা পালন করেছিল। তারা একটিবারও সেই মহিলার নাম ঠিকানা, ছবি কিংবা পরিচয় প্রকাশ করেনি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা যারা শুনেছেন তারা জানেন সেই দেশের সংবাদপত্র বা রেডিও, টেলিভিশন রগরগে তথ্য প্রচার করার জন্য কি পরিমাণ ব্যস্ত হতে পারে, কিন্তু একজন মহিলার সম্মান রক্ষা করার জন্য যদি সেই দেশের সাংবাদিকদের নিবৃত্ত করা যায় তবে সেটি আমাদের দেশে কেন করা যাবে না? নারী অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আমাদের দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমি নিশ্চিত তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করে মেয়েদের পরিচয় গোপন রেখে কীভাবে বিচার কাজ শেষ করা যাবে তার একটি উপায় খুঁজে বের করতে পারবেন। দেশের আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধগুলো করা হয় যেভাবেই হোক তার বিচারগুলো

দেশের আইনেই করতে হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে তার বিচার করানো হলে শিক্ষকদের অপমান হয়, বিচারপদ্ধতির অবমাননা হয়।

৪.

কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, দেশে দ্রুত একটি নতুন কালচার গড়ে উঠেছে। ছাত্ররাজনীতি করলে দেশের আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া যায় বলে এই কালচারটি শুরু করেছে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিছু দুর্বৃত্ত। আমি খবরের কাগজেই দেখেছি এ রকম একজন দুর্বৃত্ত নাকি তার শততম সন্ত্রমহানী ঘটানোর পর একটি অনুষ্ঠান করে সেটি উদযাপন করেছে। পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ নিয়ে যে সমাজ আনন্দোৎসব করার সুযোগ করে দেয় সেই জাতির নিজের মুখে নিজে আগুন দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কিছুদিন আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পরীক্ষা না দেওয়ার নির্দেশ না শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা পরীক্ষা দিতে বের হয়েছিল। বোমা, ককটেলের মাঝখানে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের চরম উত্তেজনার ভেতর প্রায় ৬০ জন সাহসী মেয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ থেকে তিন দশক আগে এ দেশের পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারের মাঝে এ দেশের সাহসী ছাত্রনেতারা সকল নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে সত্য এবং ন্যায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশ-মিলিটারির স্থান নিয়েছে ছাত্ররাজনীতির কিছু দুর্বৃত্ত। তাদের সকল অত্যাচার, নির্যাতন, ভয়-ভীতি এবং হুমকির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি শুরু করেছে ছাত্রীরা। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়েও সেটা শুরু করেছে ছাত্রীরা। সম্ভবত বাংলাদেশে আমরা নতুন একটি ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখছি।

যে সকল ছাত্রী ছাত্রনেতাদের হুমকি এবং নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছিল তাদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় করে তুলব।'

ইঙ্গিতটি সূক্ষ্ম কোনো ইঙ্গিত নয়। ইঙ্গিতটি অত্যন্ত স্থূল ইঙ্গিত। মেয়েদের অবমাননা করা এই দেশের ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের কাছে অপরাধ নয়, এটি তাদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের এটি একটি নতুন কালচার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরটি দেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কি করবেন দেখার জন্য আমি খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি। তার রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত একটি ছাত্র সংগঠনের ১৩ জন সদস্য পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধটি করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই ১৩ জনের ফাঁসি কিংবা সারা জীবন জেলখানায় লোহার গারদের পেছনে কাটিয়ে দিতে হতে পারে।

এই ১৩ জন ছাড়াও বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে কিন্তু এ রকম আরো অসংখ্য ১৩ জন যে প্রতিমুহূর্তে তৈরি হচ্ছে তাদের নিয়ে আমরা কি করব?

ভোরের কাগজ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

www.BanglaBook.org

প্রিয় গগন ও অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

www.BanglaBook.org